কনক-পাঠ।

'প্রকৃতি পরিচয়' ও 'বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুর
আবিষ্কার' 'বৈজ্ঞানিকী' 'প্রাকৃতিকী' 'গ্রহ-নক্ষত্র'
প্রভৃতি প্রণেতা ও বোলপুর শান্তিনিকেতন
ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যক্ষ

শ্রীজগদানন্দ রায়.

প্রণীত।

প্রকাশক—

শ্রীনগেন্দ্রকুমার রায়।

১৩২৫

মূল্য—৷৷৹ আনা।

আশুতোষ প্রেসে,

শ্রীরেবতীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সূচি-পত্র ।

কনক-পাত্র।

নিবেদন।

প্রতিদিন আমি, হে জীবনস্বামি!
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে ;
করি যোড়কর, হে ভুবনেশ্বর!
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার অপার আকাশের তলে
বিজনে বিরলে হে—
নম্রহৃদয়ে নয়নের জলে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

তোমার বিচিত্র এ ভবসংসারে
কর্ম্ম-পারাবার পারে হে,—
নিখিল জগত জনের মাঝারে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।
তোমার এ ভবে মোর কাজ যবে
সমাপন হবে হে—
ওগো রাজরাজ! একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমারি সম্মুখে।

সার্ মুতুস্বামী আয়ার্।

একাগ্রতা ও অধ্যবসায়বলে কিরূপে দুরতিক্রমণীয় বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য, ও সাধারণের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা লাভ করা যায়, মান্দ্রাজপ্রদেশের মহামতি সার্ মুতুস্বামী আয়ারের জীবন তাহার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। অনেকের বিশ্বাস দারিদ্র্য প্রতিভাবিকাশের একটি প্রবল অন্তরায়। এই বিশ্বাস একবারে ভিত্তিহীন না হইলেও, সার্ মুতুস্বামীর ন্যায় কৃতী ও স্বকর্ম্মধন্য মহাপুরুষগণের জীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয়, প্রতিভার সহিত একাগ্রতা ও অধ্যবসায় সম্মিলিত হইলে কোনও প্রকার অন্তরায়ই তাহার সমুচিত বিকাশে বাধা দিতে পারে না। আরও মনে হয়, মানুষ অবস্থার দাস নহে, অবস্থাই মানুষের দাস।

মান্দ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত তাঞ্জোর জিলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণবংশে মুতুস্বামীর জন্ম হয়। মুতুস্বামীর আর একটি ভাই ছিল। একে দারিদ্র্যাবস্থা, তাহাতে অতি অল্পবয়সেই মুতুস্বামীর পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তদীয় অনাথা মাতা দুইটি শিশুসন্তান লইয়া যে কি অকূল দুঃখসাগরে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এই মহিলা অতি উন্নতচরিত্রা ও মনস্বিনী ছিলেন; তিনি স্বয়ং বহুক্লেশ সহ্য

করিয়াও পুত্রদ্বয়কে কিঞ্চিৎ বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রভাত হইতে গভীররাত্রি পর্য্যন্ত এই মনস্বিনী মহিলার পরিশ্রমের বিরাম ছিল না। তিনি কর্ম্ম করিতে করিতে পুত্রদ্বয়কে নানা সদুপদেশ দিতেন, এবং তাহাদের মনে ও সাধুতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বীজ বপন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই বীজ যে কালে কিরূপ সুফল প্রসব করিয়াছিল, তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। কিন্তু মুতুস্বামীর মাতা তাহা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। বাল্যে মুতুস্বামীর অদৃষ্ট এমনই প্রতিকূল ছিল যে, তিনি গ্রাম্যবিদ্যালয়ের শিক্ষাও সম্পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মাতাও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। এরূপ অবস্থায় গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তায় মুতুস্বামীকে বাধ্য হইয়া বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হইল। তিনি স্থানীয় তহশীলদারের অধীনে মাসিক একটাকা বেতনে কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। অল্প দিন মধ্যেই উক্ত তহশীলদার এই পিতৃমাতৃহীন বালকের সাধুতা, কর্ম্মপটুতা, কৃতজ্ঞতা ও প্রভুভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। মুতুস্বামী স্বীয় প্রভুর খাতাপত্র লিখিবার কার্য্যে এরূপ সহায়তা করিতে লাগিলেন যে, তাহা তাঁহার ন্যায় বালকের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একদা গ্রামের বাঁধ বিধ্বস্ত হওয়ায় জলপ্লাবনে সমগ্র গ্রাম ধ্বংস হওয়ার উপক্রম হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাহার সংস্কার না করিলে গ্রামবাসিগণের অশেষবিধ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই কার্য্য সকলের নিকটই এতই দুষ্কর বোধ হইল যে, কেহই এবিষয়ে তহশীলদারকে প্রয়োজনানুরূপ পরামর্শ দিতে পারিল

না। মুতুস্বামী ধীরভাবে ঐ কার্য্যের জন্য যাহা যাহা কর্ত্তব্য তৎসমুদয় নির্ণয় করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারের মূল্যনির্দ্দেশ পূর্ব্বক এরূপ এক সুন্দর হিসাব প্রস্তুত করিয়া স্বীয় প্রভুর হস্তে দিলেন যে, তাহাতে তহশীলদার ও গ্রামের অপর সকললোকের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। তদবধি সকলেরই দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, কালে মুতুস্বামী একজন অসামান্য লোক হইবেন।

কিছুদিন পরে তহশীলদার মুতুস্বামীর কার্য্যাবলী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, এই বালক এক মুহূর্ত্ত কালও বৃথা ক্ষেপণ করে না, এমন কি, দ্বিপ্রহরে তিনঘণ্টা ছুটির সময় সে গ্রামস্থ ইংরেজিবিদ্যালয়ে যাইয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর এক কোণে বসিয়া বালকদের পাঠশ্রবণ করে। তাঁহার বেতন দিবার সাধ্য ছিল না, পুস্তক ক্রয় করাও অসাধ্য ছিল। শিক্ষকগণ দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে ঐ তিনঘণ্টা কাল বিনা বেতনে স্কুলের পাঠ শ্রবণ করিতে দিতেন। তাঁহার এইরূপ বিদ্যার্জ্জনস্পৃহা লক্ষ্য করিয়া তহশীলদার স্বয়ং স্বগৃহে তাঁহাকে একটু একটু ইংরেজিশিক্ষা দিতে লাগিলেন, পরে একটা নিম্নশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেও সাহায্য করিলেন। ১৪ বৎসর বয়সের সময় মুতুস্বামী ইংরেজি শিখিতে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালয়ে তিনি এরূপ গুণবত্তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, অচিরেই তাঁহার শিক্ষার সমুদয় ব্যয়নির্ব্বাহের ব্যবস্থা হইল। শিক্ষকগণ ও গ্রাম্য ধনিগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নিম্নবিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া

তিনি মান্দ্রাজের এক উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেন। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মিঃ পাওয়েল তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া স্কুলের বাহিরে স্বয়ং তাঁহাকে নানাবিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মুতুস্বামী স্বপ্রদেশে রচনার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া একটি পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তাঁহার রচনা এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, তদানীন্তন শিক্ষিতব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার বহু প্রশংসা করিয়াছিলেন। তখনও এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। উচ্চ ইংরেজি বিদ্যা-লয়ের শিক্ষা শেষ হইলে মুতুস্বামী শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইলেন, এবং গৃহে ব্যবহারশাস্ত্র অর্থাৎ আইন অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজের সদর দেওয়ানি আদালতের আইনের পরীক্ষায়ও সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন। তাঁহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শাসনকর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে প্রথমতঃ মুন্সেফি পদে নিযুক্ত করেন, পরে তিনি ডিপুটি কালেক্টর, সব্‌জজ, ও প্রেসিডেন্সি ছোট আদালতের জজ হইয়াছিলেন। এই সকল উচ্চপদপ্রাপ্তির পরেও তাঁহার অধ্যয়নে বিরতি ছিল না। তিনি ব্যবহারশাস্ত্রে দক্ষতা লাভ করিবার জন্য, বিশেষতঃ নানা দেশের ব্যবহারতত্ত্ব আয়ত্ত করিবার জন্য জার্ম্মাণভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সরকার বাহাদুর তাঁহাকে সি, আই, ই, উপাধিতে মণ্ডিত করিয়া মান্দ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতিপদে উন্নীত করেন। তৎপূর্ব্বে এতদ্দেশীয় কোনও লোক ঐ পদে নিযুক্ত হয় নাই। তাঁহার পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি

অসাধারণ হইলেও, তিনি প্রত্যেকটি মোকদ্দমার কাগজপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যজ্ঞানও তাঁহার প্রতিভার ন্যায় অসামান্য ছিল।

হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে মুতুস্বামী ব্যবহারাজীব-সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁহার নিকটে লোকে সুবিচার আশা করিত এবং সর্ব্বদাই সুবিচার প্রাপ্ত হইত। তিনি বেশভূষায় নিতান্ত আড়ম্বরহীন ছিলেন, এমন কি হাইকোর্টের বিচারপতির আসনে বসিবার সময়েও "কলার" (গলবন্ধ) ব্যবহার করেন নাই। তাঁহার বর্ণ অত্যন্ত কাল ছিল। তিনি স্বীয় সুকৃষ্ণদেহ সুশুভ্র-বসনে আচ্ছাদিত করিয়া এবং মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ্ ও ললাটে চন্দনের ফোঁটা ধারণ করিয়া বিচারমঞ্চে উপবেশন করিতেন। তিনি বিচারালয়েও ধূতি পরিধান করিতেন, কখনও জুতা বা মোজা ব্যবহার করিতেন না। ব্যবহারাজীবগণের সহিত তিনি সর্ব্বদা অতি ভদ্রভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেন। অথচ বিচারপতিরূপে তিনি সর্ব্বদাই অতিশয় ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করিতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি কিয়ৎকালের জন্য অস্থায়িভাবে প্রধান বিচারপতির কার্য্যও করিয়াছিলেন। ইহার অল্প কাল পরেই মুতুস্বামী সরকার বাহাদুর হইতে কে, সি, আই, ই, এই গৌরবান্বিত উপাধি লাভ করেন।

মুতুস্বামী অত্যন্ত স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন এবং হিন্দু দর্শনশাস্ত্রাদির আলোচনায় অত্যন্ত উৎসাহ দিতেন। কর্ম্ম হইতে অবসরগ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে মান্দ্রাজ

হাইকোর্টের সকলশ্রেণীর আইনব্যবসায়িগণ শোকপ্রকাশ করিয়াছিলেন, ও ভারতের সর্ব্বত্র শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর শোকভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। মান্দ্রাজ হাইকোর্টের এক প্রকাশ্য স্থলে তাঁহার মার্ব্বেলপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি দণ্ডায়মান থাকিয়া দুঃস্থ ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে আহ্বান করিতেছে।

জমাদার গোবিন্দ সিংহ।

(ভিক্টোরিয়া ক্রস্)

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ক্রিমিয়াসমরে ইংরেজগণ অসীম বীরত্ব প্রকাশ-পূর্ব্বক জয়লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে আমাদের পরলোকগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়া সমরবিজয়ী মহাবীরগণকে যে প্রকার সম্মানিত ও পুরস্কৃত করিয়াছিলেন,তাহা ইতিহাসের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। মহারাণীর অভিপ্রায় অনুসারে কেহ উচ্চতর পদে উন্নীত হইয়াছিলেন, কেহ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও তরবারি উপহার পাইয়াছিলেন এবং কেহ বীরজনবাঞ্ছিত দুর্লভ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। রাজ্যের সুসন্তানগণকে এই প্রকারে পুরস্কৃত করিয়াও মহারাণী সন্তোষলাভ করেন নাই; ইংরাজ সৈনিকদিগের মধ্যে যাঁহারা আসন্ন মৃত্যুভয় উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অসীম সাহসিকতা ও স্বার্থত্যাগের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" নামক সম্মানসূচক পদক এই সময় হইতে মহারাণীর ইচ্ছায় প্রথম প্রদত্ত হইতে থাকে। ইহা স্বর্ণ, রৌপ্য বা অপর কোন বহুমূল্য ধাতু দিয়া প্রস্তুত নহে; স্বল্পমূল্যের পিত্তলই ইহার উপাদান; তথাপি সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র পদাতিক পর্য্যন্ত সকলেই এই পদক-লাভের আশায় লালায়িত থাকেন। যে সকল আত্মত্যাগী সাহসী বীর "ভিক্টোরিয়া ক্রস্' লাভ করিয়াছেন, রাজদরবারে তাঁহারা মুকুট-

ধারী রাজাধিরাজ অপেক্ষা অধিকতর সম্মান প্রাপ্ত হয়েন। সম্প্রতি একজন ভারতীয় সৈন্য কিপ্রকারে এই পদক লাভ করিয়াছে, এই প্রবন্ধে আমরা তাহা বিবৃত করিব।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী মহাসমরের সূত্রপাত হয়। আমাদের মহামহিম সম্রাট্ ন্যায় ও সত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়া, এই সমরে যোগদান করেন। ইহার পরে চারি বৎসর ব্যাপিয়া জলে স্থলে এবং আকাশে যে ভয়ানক যুদ্ধ চলিতেছে, তাহার তুলনা কোনও দেশের ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। এই ভীষণ সমরে সম্রাট্ যোগদান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া ভারতের করদ নৃপতিগণ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা শত্রুদমনের জন্য নিজ নিজ রাজ্যের সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন, এবং কেহ কেহ স্বয়ং অস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের বেতনভুক্ ভারতীয় সৈন্যগণ সাহস, সমরকুশলতা ও রাজভক্তির জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। তাঁহারাও জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আমাদের সম্রাটের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য ফ্রান্সের সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা বিশেষরূপ সাহসও রণকুশলতা দ্বারা ইতিমধ্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, জমাদার গোবিন্দ সিংহ তাহাদের অন্যতম।

১৯১৭ সনে ফ্রান্সের ক্যাম্‌রাই নামক স্থানে যখন ইংরেজ ও ফরাসীদিগের সহিত জর্ম্মাণদিগের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন এক ভারতীয় সৈন্যদলে বীর গোবিন্দ সিংহ উপস্থিত

ছিলেন। তাঁহার দিব্য কান্তি, সিংহের ন্যায় বিপুল বিক্রম এবং অসামান্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, প্রথম হইতেই সেনা-নায়কগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, সামান্য অশ্বারোহী সৈনিক হইলেও গোবিন্দ সিংহ অচিরকালমধ্যেই বীরত্বে খ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারিবেন। ক্যাম্‌রাই যুদ্ধে একদা শত্রুগণ যখন রণসজ্জায় ব্যাপৃত ছিল, তখন মহাপরাক্রম ব্রিটিশ-বাহিনীর এক অংশ অদূরে শিবিরসংস্থানপূর্ব্বক শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে-ছিল। ব্রিটিশ সেনা-নায়কগণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যদি এই সময়ে কতকগুলি সৈন্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে শত্রুগণ পরাভূত হইয়া বন্দী হইবে। গোবিন্দ সিংহ যে সৈন্যদলে ছিলেন, সেই দলই প্রথমে ভীমগতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইল। শত্রুগণ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া ভীত হইয়া পড়িল, এবং কামান বন্দুক প্রভৃতি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ভারতীয় সৈন্যগণ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু কিয়ৎকাল মধ্যে দেখা গেল, শত্রু দূরে পলায়ন করে নাই; নূতন অস্ত্রাদি সংগ্রহ করিয়া তাহারা ভারতীয় সৈন্যগণের তিনপার্শ্ব বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান আছে। সম্মুখেই আবার একটি দুস্তর নদী! সুতরাং ভারতীয় সৈন্যগণের বহির্গমনের সকল পথই রুদ্ধ। অদূরবর্ত্তী শিবিরে যে অগণ্য ব্রিটিশ সৈন্য অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নিকটে সংবাদ প্রেরণেরও উপায় নাই।

এই প্রকারে অবরুদ্ধ হইয়া ভারতীয় সৈন্যগণ ভূপৃষ্ঠে নাতি-

গভীর খাত খনন করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে খাতের উপরে উঠিয়া বিপক্ষদিগের প্রতি অজস্র গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। ইহাতে শত শত শত্রু-সৈন্য ভূমিশায়ী হইতে লাগিল এবং তাহাদিগের শোণিতধারায় রণক্ষেত্র কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু তখনও অবশিষ্ট শত্রু পলায়ন করিল না।

এদিকে রাত্রি সমাগত হইল, এবং ভারতীয় সৈন্যদিগের ভাণ্ডারে যে গোলাগুলি ও বারুদ ছিল, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। এতক্ষণে তাঁহারা চিন্তাকুল হইলেন। ক্রোশাধিক দূরে ব্রিটিশ-সৈন্যগণ স্তূপীকৃত যুদ্ধাস্ত্র ও গোলাগুলি লইয়া অবস্থান করিতেছিল; সংবাদ পাঠাইলেই প্রচুর গোলাবারুদ ভারতীয় সৈন্যগণের হস্তগত হইতে পারে; কিন্তু উভয়পক্ষের গোলাবৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংবাদ বহন করে, এমন সামর্থ্য কাহারও হইল না।

সেনা-নায়ক উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"অদ্যকার এই রজনী উৎসবের রজনী নহে; ইহা রাজভক্তি ও বীরত্বের পরীক্ষার জন্যই সমাগত হইয়াছে; তোমাদের মধ্যে কি এমন কোনও বীর নাই, যে দেড় মাইল দূরবর্ত্তী ব্রিটিশ শিবিরে এখানকার প্রয়োজন জ্ঞাপন করিয়া আসিতে পারে ?"

সেনা-নায়কের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলেই ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ রহিলেন। সৈন্য মণ্ডলীর এক প্রান্তে সৌম্য গোবিন্দ সিংহ নতমুখে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি এই আহ্বানবাণী শ্রবণ করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; দৃঢ় পদক্ষেপে সেনানায়কের

সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"আমার সমগ্র শক্তি এবং এই তুচ্ছ জীবন আজ প্রজাবৎসল সম্রাটের সেবায় উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত আছি। যাহার হৃদয় শক্তিসম্পন্ন বাহিরের সহস্র বাধা তাহার গতিরোধ করিতে পার না। আমি হৃদয়ে বল পাইয়াছি, জীবননাশের আশঙ্কা আজ কর্ত্তব্যপথে বাধা দিতে পারিবে না।"

গোবিন্দ সিংহের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া সৈন্যগণ আনন্দ-ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

* * * * *

রজনী প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি গোলা বর্ষণ করিয়া উভয়পক্ষই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কামানের গভীর গর্জ্জন তখনও নীরব হয় নাই। মধ্যে মধ্যে অতর্কিত ভাবে এক একটি গোলা ভীমবেগে আগমন করিয়া উভয় পক্ষেরই সৈন্যগণের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার করিতেছিল। গোবিন্দ সিংহ সেনা-নায়কের পত্র লইয়া ব্রিটিশ শিবিরাভিমুখে অশ্বারোহণে ছুটিতে লাগিলেন। নদী পার হইয়া যাওয়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না; কাজেই যে স্থানে উভয় পক্ষের কামানের গুলি ক্ষণে ক্ষণে শিলাবৃষ্টির ন্যায় পতিত হইতেছিল, সেই স্থানের দিকেই তাঁহাকে অশ্বচালনা করিতে হইল। দক্ষিণে এবং বামে বড় বড় অগ্নিগর্ভ গোলা পতিত হইয়া বজ্রনিনাদে বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু গোবিন্দ সিংহকে অনুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিল না; তাঁহার সুশিক্ষিত অশ্ব পবনগতিতে ছুটিতে লাগিল।

ক্রমে ব্রিটিশ শিবির দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আর ছয় শত

গজ অগ্রসর হইলেই গোবিন্দ সিংহ তথায় উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু এই অত্যল্প ব্যবধান নিরাপদে যাওয়া ঘটিল না। হঠাৎ একটি বৃহৎ গোলা তাঁহার বামপার্শ্বে পতিত হইয়া ভীষণশব্দে বিদীর্ণ হইল এবং তাহার কয়েকটি অংশ ছুটিয়া আসিয়া অশ্বটিকে আহত করিল। গোবিন্দ সিংহের প্রিয় অশ্ব এই কঠিন আঘাত সহ্য করিতে পারিল না, প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়াই ভূমিশায়ী হইল। সৌভাগ্যক্রমে গোবিন্দ সিংহ আহত হইলেন না বটে, কিন্তু প্রিয়তম অশ্বের মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তখন বিলাপের অবসর ছিল না; কোন দিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া গোবিন্দ সিংহ ব্রিটিশ-শিবিরাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিলেন। যখন তিনি শিবিরে উপস্থিত হইলেন তখন তাঁহার দেহ অবসন্ন এবং গাত্রবস্ত্র অশ্বের রক্তে রঞ্জিত। শিবির-বাসী সৈন্যগণ জমাদার গোবিন্দ সিংহের এই অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

১৯১৮ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের মহামান্য সম্রাটের ইচ্ছায় বাকিংহাম্ প্রাসাদে একটি মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল। জলযুদ্ধে, স্থলযুদ্ধে এবং বিমানপথে যে সকল বীর বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্রাটের নিকট হইতে নানা উপাধি ও পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জমাদার গোবিন্দ সিংহকেও এই সভায় সাদরে আহ্বান করা হইয়াছিল। সম্রাট্ করমর্দ্দনপূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া সম্মিলিত মহাবীরমণ্ডলীর সমক্ষে গোবিন্দসিংহকে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ উপহার দিয়াছিলেন।

মাতৃদেবী।

মা আমার স্নেহময়ী করুণারূপিণী!
এ জগতে কোথা আছে তুলনা তোমার?
স্নেহের মুরতিরূপে আছে গো জননি!
অনুপম স্নেহ তব অনন্ত-অপার!

"মা" কথা মধুর কিবা আরাম দায়িনী
রোগশয্যা'পরে কিংবা দূর পরবাসে,
উদ্দেশে "মা" বলে আমি ডাকি গো যখনি,
শান্তি-সমীরণ বহে অন্তর-আকাশে।

হইলে পীড়িত এই ভঙ্গুর শরীর,
অনাহারে অনিদ্রায় শুশ্রূষায় রত
রয়েছ মা; ঝরিয়াছে কত অশ্রুনীর,
শ্রাবণের ধারাসম হায়, অবিরত!

মহাবীর কিংবা মহাবিজ্ঞ যদি হই,
ঐশ্বর্য্য সাম্রাজ্য আদি ভাগ্যে যদি ঘটে,
থাকিব, থাকিব আমি জানি, স্নেহময়ি!
স্নেহের পুতুল সম তোমার নিকটে।

লোক মুখে শুনি' মম সুযশের বাণী
করতলে পাও যেন পূর্ণিমার চাঁদ,
পশিলে শ্রবণে মম নিন্দা কিংবা গ্লানি,
শেলসম বিঁধে হৃদে, ঘটে পরমাদ।

এমন স্নেহের শোধ কেবা দিতে পারে?
রত্নসিংহাসনে পদ করিয়ে স্থাপন,
দিবানিশি পূজি যদি শত উপচারে,
যোগ্য প্রতিদান সেও নহে কদাচন।

প্রেমময়ী বিশ্বমাতা জগত জননী,
প্রতিনিধি তাঁর তুমি জগত-মাঝারে,
নিঃস্বার্থ পবিত্র স্নেহে দিবস যামিনী
তাঁর প্রতি ভক্তিশিক্ষা দিতেছ আমারে।

তব স্নেহে পরিব্যক্ত করুণা তাঁহার
গোস্পদে বিম্বিত যথা অনন্ত আকাশ,
জ্ঞানহীন অন্ধ আমি কি বলিব আর?—
তেমতি তোমাতে মাগো তাঁহার প্রকাশ।

ভারতের ঋতুপর্য্যায়।

ঋতুবৈচিত্র্যের জন্য চিরদিন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধি আছে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত, প্রত্যেক ঋতু পর্য্যায়-ক্রমে অভিনব রূপ গ্রহণ করিয়া ভারতে অবতীর্ণ হয়। গ্রীষ্মে যখন তাপদগ্ধা বসুন্ধরা বারিধারা প্রার্থনা করে, এবং রুদ্রমূর্ত্তি বৈশাখঝটিকা ধূলিধ্বজা উড়াইয়া ও মেঘগর্জ্জনচ্ছলে শঙ্খনাদ করিয়া সলিলবর্ষণ করে, তখন প্রকৃতির এক নূতনমূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। ইহার পরে ধরিত্রী যখন নব আষাঢ়ের স্নিগ্ধ জলধারায় সুস্নাত হইয়া শ্যামলদূর্ব্বাদলবসনে দেহ আবৃত করে, তখন প্রকৃতির আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়। তাহার কিছু দিন পরে, শেফালিপ্রভৃতির গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠে এবং দিগন্তবিস্তৃত হরিৎ শস্যক্ষেত্র ক্রমে সুবর্ণবর্ণে শোভিত হইয়া ধরণীতে শরৎ ও হেমন্তের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করে। তৎপরে আবার কৃষকগণের নবশস্যলাভের আনন্দধ্বনি-মধ্যে যখন শিশিরের অপূর্ব্ব শ্রী ফুটিয়া উঠে, এবং বসন্তের দক্ষিণ-বায়ুস্পর্শে যখন বৃক্ষলতাগুল্ম নব পুষ্পপত্রে পুলকপ্রকাশ করিতে থাকে, তখন প্রকৃতিদেবীর অপর এক কান্তি দৃষ্টি-গোচর হয়।

এই সকল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে, যে সকল সাগর-মহাসাগর ভারতবর্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং যে সকল নদীগিরি ও সুবিস্তীর্ণ উচ্চ ও নিম্ন-ভূমি

ভারতের বৈচিত্র্য-বিধান করিতেছে, তাহাদের অবস্থানাদির আলোচনা, এবং বায়ু-প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত আবশ্যক।

কোন স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে, চতুর্দ্দিকের বায়ুরাশি সবেগে আগমন করিয়া তাহা প্রবলতর করে। গৃহদাহের সময়ে এই প্রকার বায়ুপ্রবাহ সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়। হয়ত অন্যত্র প্রকৃতি নির্ব্বাত, কিন্তু যে গৃহখানি দগ্ধ হইতেছে, তাহার চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুরাশি ঝটিকাবেগে তথায় ধাবিত হইয়া অগ্নি উত্তেজিত করিয়া তুলে। পণ্ডিতগণ বলেন, অগ্নির তাপে বায়ু প্রসারিত হইয়া লঘুতর হয়, এবং তদ্রূপ হইলে, তাহা আর পার্শ্বের ঘনবায়ুর ভিতরে অবস্থান করিতে পারে না। জলের তুলনায় কাষ্ঠ লঘু, এজন্য কাষ্ঠ জলমগ্ন করিতে গেলে, তাহা যেমন ভাসিয়া উঠে, অগ্নির সংস্পর্শে যে বায়ুরাশি স্ফীত হইয়াছে, তাহাও অবিকল সেই প্রকারে উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। কিন্তু কোন স্থান স্বভাবতঃ বায়ুশূন্য থাকিতে পারে না; সুতরাং অগ্নির উপরিস্থিত বায়ু লঘুতর হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলেই পার্শ্বের বায়ু দ্রুতবেগে আসিয়া শূন্য স্থান পূর্ণ করে। কেরোসিনের দীপের চারিদিকে যে কাচের আবরণ থাকে, তাহার উপরে কতকগুলি ক্ষুদ্র কাগজের টুকরা ছাড়িয়া দিলে, সেগুলি ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে দেখা যায়। ইহাও লঘু বায়ুর ঊর্দ্ধগমনের অপর উদাহরণ। অগ্নি-শিখার তাপে আবরণের উপরিস্থিত বায়ু স্ফীত ও লঘু হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহা পূর্ব্ব স্থানে স্থির না থাকিয়া উপরে উঠিতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে কাগজগুলিকেও উড়াইয়া

লইয়া যায়। বায়ুপ্রবাহমাত্রেরই উৎপত্তির মূলে লঘুবায়ুর ঊর্দ্ধ-গমন এবং তথায় পার্শ্বস্থ বায়ুর সবেগে আগমন, এই দুই ব্যাপার বর্ত্তমান থাকে। বৈশাখের অপরাহ্নে যখন মহাঝটিকার তাণ্ডবনৃত্য আরব্ধ হয়, এবং শতক্রোশব্যাপী ঘূর্ণিবায়ু আবর্ত্তন করিতে করিতে ধনজনপূর্ণ বহু অর্ণবপোত ও নগরের ধ্বংসসাধন করে, তখনও বুঝিতে হয়, পৃথিবীর কোন অংশের বায়ুরাশি নিশ্চয়ই কোন কারণে লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতেছে, এবং সেই কারণে অন্য স্থান হইতে বায়ু তাহার স্থান পূরণ করিবার জন্য সবেগে আগমন করিতেছে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি কয়েক মাস ব্যাপিয়া দক্ষিণ বা দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে যে স্বাস্থ্যপ্রদ সুখস্পর্শ বায়ু অবিরাম মৃদুবেগে প্রবাহিত হয়, এবং পরে উত্তর দিক্ হইতে যে মৃদু বায়ুপ্রবাহ আসিয়া শীত ঋতুর সূচনা করে, তাহা দেখিলেও বুঝিতে হয়, দেশের বা দেশসন্নিহিত কোন স্থানের বায়ুরাশি অবিরাম লঘু হইয়া উপরে উঠিতেছে, এবং এই কারণে শূন্য স্থান পূরণ করিবার নিমিত্ত পার্শ্বের বায়ু দ্রুতবেগে আগমন করিয়া প্রবাহের উৎপত্তি করিতেছে।

বায়ুপ্রবাহের সহিত দেশের বৃষ্টিপাতের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। আবার ঋতুবৈচিত্র্য বারিপাতেরই উপরে নির্ভর করে। দক্ষিণ বায়ুই সমুদ্র হইতে জলীয়বাষ্প বহন করিয়া ভারতে প্রবিষ্ট হয়। তাহার পরে, স্থানীয় শীতলবায়ুযোগে বা উচ্চপর্ব্বতের শীতলস্পর্শে সেই বাষ্প ঘনীভূত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। সেই মেঘই বৃষ্টিধারায় পরিণত হয়। সুতরাং সজল সমুদ্রবায়ুর

প্রবাহকেই বর্ষার সৌন্দর্য্যের মূলকারণ বলা যাইতে পারে। ইহার পর, এই বায়ুপ্রবাহের পরিবর্ত্তন হইলে যখন আকাশ মেঘনির্মুক্ত হয় এবং বর্ষার বারিধারাপুষ্ট বৃক্ষলতা ফলপুষ্পে পরিশোভিত হয়, তখন শরৎ ও হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে। শীত ঋতুর শোভাও উত্তরাগত শীতল বায়ুপ্রবাহের উপরে নির্ভর করে। এই প্রবাহ প্রায় জলীয়বাষ্পবর্জ্জিত। এই কারণে, শীতের আকাশ নির্ম্মল থাকে এবং প্রচুর শিশিরপাত হয়। কতকগুলি উদ্ভিদ্ এই শিশিরেই পুষ্ট ও সুন্দর হইয়া দাঁড়ায়, এবং কতকগুলি আবার শীতল বায়ুর স্পর্শে শ্রীভ্রষ্ট ও স্তব্ধ হইয়া বসন্তের ঈষদুষ্ণ বায়ুপ্রবাহের প্রতীক্ষায় কালযাপন করে। ফাল্গুনে দিনগুলি দীর্ঘতর হইলে, এবং দক্ষিণবায়ুর প্রবাহ আরব্ধ হইলে, এই সকল মৃতবৎ বৃক্ষলতায় নূতন জীবনীশক্তির সঞ্চার হয়, তখন উহারা পুরাতন পত্রাবলী জীর্ণবস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়া নূতন শ্যামলবসনে দেহ আবৃত করে এবং নব-পুষ্পপত্রে বসন্তশ্রীকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, বৎসরের নানা সময়ে যে সকল বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হয়, তাহারাই ভারতের ঋতুপরিবর্ত্তনের মূলকারণ।

বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন ভূমির উপরিস্থিত বায়ু কি প্রকারে লঘু হইয়া জলীয়বাষ্পপূর্ণ সামুদ্রিক বায়ু ও শুষ্ক উত্তরবায়ুর উৎপত্তি করে, তাহা আলোচনা করা যাউক।

পৃথিবীতে আমরা যে সকল পদার্থ দেখিতে পাই, তাহাদের

সকলের গুণ সমান নয়। মৃৎপিণ্ড এবং লৌহগোলক উভয়ই কঠিন পদার্থ; কিন্তু কিয়ৎকালের জন্য উহাদিগকে রৌদ্রে রাখিলে দেখা যায়, লৌহগোলক মৃৎপিণ্ড অপেক্ষা উষ্ণতর হইয়াছে। একই তাপে নানা পদার্থের উষ্ণতার এই তারতম্য কেবল লৌহ ও মৃত্তিকাতেই সীমাবদ্ধ নয়। বালুকাময় নদী-তীর ও তৃণাবৃত ভূমিখণ্ড যে সৌরতাপে সমান উষ্ণ হয় না, তাহা আমরা অনেকসময়েই দেখিতে পাই। জল ও মৃত্তিকা লইয়া পরীক্ষা করিলেও এই অসম উষ্ণতার লক্ষণ আরও পরিস্ফুট হয়। জলের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহা সহজে উষ্ণ হয় না এবং একবার উষ্ণ হইলে শীঘ্র তাপত্যাগ করিয়া শীতল হয় না। কিন্তু শিলা ও মৃত্তিকার ধর্ম্ম সেরূপ নয়। এগুলি অল্পতাপেই যথেষ্ট উষ্ণ হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে তাপত্যাগ করিয়া শীতল হইয়া যায়। এই কারণেই বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপে পূর্ব্বাহ্নে যখন জলাশয়ের বারিরাশি শীতল থাকে, তখন স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হইয়া উঠে। আবার সন্ধ্যার আগমনে যখন স্থলভাগ শীঘ্র তাপত্যাগ করিয়া শীতল হয়, তখন জলাশয়ের জলে উষ্ণতা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। বৈজ্ঞানিকগণ জল ও স্থলভাগের উষ্ণতার এই বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তির কারণ নির্ণয় করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে মহাসাগর অবস্থান করিতেছে। এই জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের দীর্ঘ ও উষ্ণ দিবসে ভারতের স্থলভাগ যখন সমুদ্রের তুলনায় অধিকতর উত্তপ্ত হয়, তখন ভূসংলগ্ন বায়ুরাশিও

উষ্ণ ও লঘু হইয়া উপরে উঠিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই অবস্থায় দক্ষিণ বা দক্ষিণপশ্চিম দিক্ হইতে সমুদ্রের বায়ু শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য ধাবমান হয়। ইহাই জলীয়বাষ্পপূর্ণ দক্ষিণ বায়ু। জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ হইতে আশ্বিনের কিয়দ্দিন-পর্য্যন্ত ইহা ভারতে সঞ্চরণ করে এবং উচ্চপর্ব্বতে প্রতিহত হইলেই, ইহার সহিত যে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে, তাহা ঘনীভূত হইয়া বর্ষার সূচনা করে।

ভারতের মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, দক্ষিণভারতে করাচি হইতে নর্ম্মদানদীপর্য্যন্ত ভূভাগে উচ্চ পর্ব্বত নাই। এই জন্য রাজপুতনার বালুকাময় ভূমি ও সিন্ধু প্রদেশের উপর দিয়া জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ুপ্রবাহ বারিবর্ষণ না করিয়া অবাধে চলিয়া যায়, এবং পরে পঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের সীমান্তে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া প্রচুর বারিপাত আরম্ভ করে।

দক্ষিণভারতের পূর্ব্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ, তিন দিকেই সমুদ্র। পশ্চিমঘাট-শৈলশ্রেণীতে প্রতিহত হইয়া দক্ষিণবায়ু মালবদেশে বর্ষণ আরম্ভ করে। এই স্থানে বৎসরে প্রায় একশত কুড়ি ইঞ্চি বৃষ্টি পতিত হয়, অর্থাৎ বৎসরে যে বৃষ্টি পতিত হয়, তাহা স্থানান্তরে অপসৃত বা শুষ্ক হইয়া না গেলে, বৎসরে সঞ্চিত জলের গভীরতা প্রায় সাত হাত হইয়া দাঁড়ায়। অতএব এই বারি পরিমাণে বড় অল্প নয়।

বঙ্গদেশে ও আসামে যে বাষ্পে বারিপাত হয়, তাহা বঙ্গোপ-

সাগর হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়া খাসিয়া পর্ব্বতে প্রথমে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইহাতে চেরাপুঞ্জী-অঞ্চলে মুষলধারে অবিরত বৃষ্টি হইতে থাকে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই স্থানে বৎসরে যে বৃষ্টি হয়, তাহা সঞ্চিত হইলে, স্থানটিকে প্রায় চল্লিশ হাত গভীর জলে নিমগ্ন রাখিতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে এই স্থানের বারিপাতের পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যাহা হউক, এই বায়ুই যখন হিমালয়ে বাধা পাইয়া পশ্চিমোত্তরমুখে চলিতে আরম্ভ করে, তখন তদ্দ্বারা বঙ্গদেশে বারিবর্ষণের আরম্ভ হয়। এই জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু-প্রবাহ হিমালয়ের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া কখনই উত্তরে যাইতে পরে না। হিমালয়ের অপরপার্শ্বস্থ তিব্বতাদি প্রদেশ এই কারণেই বৃষ্টির অভাবে মরুভূমিপ্রায় হইয়াছে।

কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে যখন দিনমান রাত্রিমানের তুলনায় ক্ষুদ্রতর হইয়া পড়ে, তখন ভারতের স্থলভাগ সুদীর্ঘ রজনীতে তাপত্যাগ করিয়া সমুদ্রজল অপেক্ষা শীতলতর হইয়া পড়ে। এই কারণে সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ুরাশি উষ্ণ ও লঘু হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকিলে, ভারতবর্ষের উপর দিয়া এক বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রের উপরিস্থিত শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য ধাবমান হয়। ইহাই উত্তর বা পূর্ব্বোত্তর বায়ুপ্রবাহ। ভারতের উত্তরে সমুদ্র নাই। সুতরাং এই বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে না, এবং ইহার সঞ্চরণে বারিপাতও হয় না। কেবল বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া ইহার যে অংশটি ভারতের পূর্ব্বদক্ষিণ-উপকূলবর্ত্তী

শৈলমালায় আহত হয়, তাহাই সমুদ্রের জলীয়বাষ্প বহন করিয়া করমণ্ডল প্রদেশে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করে।

বৃষ্টির বারিধারা কেবল ঋতুর বৈচিত্র্যবিধান করিয়াই নিবৃত্ত হয় না, ইহা ভূপৃষ্ঠেরও নানাবৈচিত্র্য বিধান করে। তদ্ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের নানা আবর্জ্জনা এবং বায়ুমণ্ডলে প্লবমান ধূলিকণা ও ধূমাদি ধৌত করিয়া জীবজগতের অশেষ কল্যাণ করাও ইহার আর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য্য। প্রবল বায়ুকর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে ধূলিকণা আকাশে উত্থিত হয়, এবং শত শত কল-কারখানার চুল্লী হইতে যে ধূমরাশি নিয়তই বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হয়, তাহা কখনই জীবের স্বাস্থ্যের অনুকূল নহে। প্রাণিগণ দীর্ঘকাল এই কলুষিত বায়ু গ্রহণ করিলে অসুস্থ হইয়া পড়ে। পত্রাবলীতে যে ধূলিস্তর সঞ্চিত হয়, তাহা উদ্ভিদের স্বাস্থ্যভঙ্গ করে। যখন বৃষ্টির জল ভূতলে পড়িতে আরম্ভ করে, তখন এই সকল আবর্জ্জনা ধৌত হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালে যখন বায়ুমণ্ডল ধূলিপূর্ণ এবং তরুলতা ধূলিধূসরিত হইয়া অবস্থান করে, তখন বৃষ্টির অব্যবহিত পরে আকাশ যে কেমন নির্ম্মল এবং উদ্ভিদ্‌গুলি যে কি প্রকার শ্রীসম্পন্ন হয়, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।

পর্ব্বত বা উচ্চভূমিতে যে বর্ষণ হয়, তাহার জল একত্র হইয়া যখন নিম্নভূমিতে আসিয়া পড়ে, তখন তাহা নির্ম্মল থাকে না। উচ্চ স্থানের নানা আবর্জ্জনা ও মৃত্তিকাদি ধৌত করিয়া ইহা নিম্নে গমন করিতে থাকে। তৎপরে, এই জলরাশি নদীর সহিত মিলিত হইলে, তাহার কর্দ্দম ও আবর্জ্জনা নদীপ্রবাহের

সহিত দূরান্তরে চালিত হয়। সমুদ্র ও নদীর সঙ্গমস্থলে যে সকল ব-দ্বীপের উৎপত্তি দেখা যায়, তাহা নদীপ্রবাহ-বাহিত মৃত্তিকাদি দ্বারাই গঠিত। খরস্রোতে পতিত হইয়া কর্দ্দমরাশি নদীগর্ব্ভে সঞ্চিত হইতে পারে না। বন্যার সময় নদীর যে জল উভয়কূল প্লাবিত করিয়া স্রোতোহীন হয়, কেবল তাহারই কর্দ্দম নদীতীরবর্ত্তী ভূভাগে সঞ্চিত হইয়া ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। সমুদ্রে নদীর ন্যায় স্রোত নাই। এজন্য নদী যখন সমুদ্রের সহিত মিলিত হয়, তখন মিলনস্থলে তাহা স্রোতোহীন হইয়া পড়ে, ইহাতে জলের সমুদয় কর্দ্দমই সঙ্গমসন্নিহিত-স্থানে সঞ্চিত হইয়া নূতন স্থলভাগের উৎপত্তি করে। আমাদের দেশের সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা এবং আফ্রিকার নীল-প্রভৃতি নদনদী উচ্চ স্থানের ক্ষয় এবং নিম্ন স্থানের পূরণ করিয়া ভূভাগের যে বৈচিত্র্যবিধান করিতেছে, তাহা দেখিলে বৃষ্টির জল ও নদীর কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি, উভয়েরই ফল অতি ভয়ঙ্কর। ভারতসাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান স্থানে বৎসরে কি পরিমাণ বারিপাত হয়, বায়ুর উষ্ণতা কত ও তাহাতে কি পরিমাণ জলীয়বাষ্প মিশ্রিত আছে, তাহা রাজব্যয়ে নির্ণীত হইয়া থাকে। এক্ষণে ভারতের প্রায় সার্দ্ধদ্বিসহস্র নগরে বারিপাতাদি পরিমিত হইতেছে। বায়ুপ্রবাহের পরিবর্ত্তন ও বৃষ্টির তারতম্য দীর্ঘকাল লিপিবদ্ধ থাকায় বৃষ্টিবাত্যাদিসম্বন্ধে যে সকল নিয়ম আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে দেশের অশেষ

উপকার হইতেছে। কোন্ প্রদেশে শীঘ্র বারিপাত হইবার সম্ভাবনা আছে, প্রতিসপ্তাহেই সরকারী গেজেটে তাহার পূর্ব্বাভাস প্রচারিত হয়। ইচ্ছা করিলে কৃষক ও ব্যবসায়িগণ ইহা জানিয়া ভবিষ্যতের লাভালাভ বিচার করিয়া সতর্ক হইতে পারে।

এতদ্ব্যতীত আবহবিভাগের সুপণ্ডিত কর্ম্মচারিগণ ঝটিকা বা প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর আগমনসম্ভাবনা জানিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বাংশে যে ঘোষণালিপি প্রচার করেন, তাহাও দেশের অশেষ কল্যাণসাধন করিতেছে। যখন আসন্ন ঝটিকার সংবাদ অবগত হইবার উপায় ছিল না, তখন প্রতিবৎসরেই যাত্রিপূর্ণ বহু অর্ণবপোত ও নৌকা অকস্মাৎ ঝটিকাক্রান্ত হইয়া প্রায়ই জলমগ্ন হইত। এক্ষণ ঝটিকার আগমনসম্ভাবনা পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া পোতাধ্যক্ষগণ সাবধান থাকেন। বঙ্গের আলিপুরে, বোম্বাইয়ের কোলাবা-নামক স্থানে, মান্দ্রাজের কোদাইকানাল নগরে এবং কাশ্মীর ও পঞ্জাবের কয়েকটি পার্ব্বত্য স্থানে রাজব্যয়ে বৃষ্টিবাত্যাপরিমাপণের জন্য যে সকল পর্য্যবেক্ষণাগারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহাদের কার্য্যাবলীতেও জনসাধারণের পরম উপকার হইতেছে।

বায়ুর উপাদান ও ক্রিয়া।

আমরা বায়ু দেখিতে পাই না সত্য, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব সকল সময়েই উপলব্ধি করিতে পারি। প্রবল ঝটিকার সময়ে যখন বৃহৎ মহীরুহগণ উন্মূলিত হইতে থাকে, তখন তাহার বিক্রম দেখিয়া আমরা বিস্মিত হই। নিদাঘের অপরাহ্নে প্রকৃতি যখন অবসন্ন ও স্তব্ধ হয় এবং বৃক্ষচূড়ার পত্রাবলীও যখন চঞ্চলতা পরিত্যাগ করে, তখনও সহসা দক্ষিণাগত বায়ু শীতল-স্পর্শে নিজের অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। কাচ ও অগভীর জল উভয়ই স্বচ্ছ, এজন্য কোন পাত্রে অল্প জল রাখিলে বা সম্মুখে একখণ্ড পরিষ্কৃত কাচ ধরিলে চক্ষুর সাহায্যে সহসা জল বা কাচ কোনটিরই অস্তিত্ব জানা যায় না। কাচ ও জল অপেক্ষা বায়ু আরও স্বচ্ছ, এজন্য দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা ইহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা অসম্ভব।

জল ও শর্করা উভয়ই প্রায় স্বচ্ছ বস্তু। ইহাদের মিশ্রণে জলের স্বচ্ছতার হানি হয় না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সরবতে যেমন শর্করা ও জল বর্ত্তমান থাকে, বায়ুতে সেই-প্রকার অম্লজান, অর্থাৎ অক্সিজেন এবং যবক্ষারজান, অর্থাৎ নাইট্রোজেন নামক দুইটি স্বচ্ছ বায়বীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে। সরবতে শর্করা ও জল উভয়েরই গুণ অব্যাহত থাকে; জল

তাহার শৈত্য ও তারল্য প্রভৃতি ধর্ম্ম হারায় না এবং শর্করাও তাহার স্বাদুতা ত্যাগ করে না। অম্লজান ও যবক্ষারজান নামক যে দুই বাষ্পের মিশ্রণে বায়ুর উৎপত্তি,তাহারাও মিশ্রিত অবস্থায় নিজ নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না।

ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য কিছুদিন যত্নপূর্ব্বক পরিষ্কার না করিলে সেগুলিতে স্থানে স্থানে গৈরিকবর্ণের মরিচা সঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে। লৌহময় দ্রব্য আর্দ্র স্থানে রাখিলে এই মরিচার পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হয়, এবং পরিশেষে ঐ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বায়ুর অম্লজানই এই মরিচার উৎপত্তি করে। দুইটি পৃথক্ বাষ্পের যোগে যে বায়ুর উৎপত্তি হয়, প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণ তাহা জানিতেন না। বায়ুস্পর্শে কতকগুলি ধাতুতে যে মরিচার উৎপত্তি হয়, তাহা দেখিয়াই ক্রমে তাঁহারা এই তথ্য নির্ণয় করেন। একটি কাচপাত্রে কয়েকখণ্ড লৌহ রাখিয়া পাত্রের মুখ বন্ধ করা হইয়াছিল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে, লৌহে মরিচা ধরিয়াছে এবং পাত্রস্থিত বায়ুর পরিমাণেরও হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বায়ুর যে অংশ মরিচার উৎপত্তিকার্য্যে ব্যয়িত হয়, বৈজ্ঞানিকগণ তাহাকেই "অম্লজান" নামে অভিহিত করেন এবং মরিচা ধরার পরেও পাত্রে যে অংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে "যবক্ষারজান" সংজ্ঞা দিয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা পাঁচ ভাগ বায়ুর মধ্যে একভাগ অম্লজান এবং অবশিষ্ট চারিভাগ যবক্ষারজান পাওয়া গিয়াছে।

কেবল মরিচার উৎপত্তি করাই অম্লজানের কার্য্য নয়, দহন-কার্য্যের ইহাই প্রধান সহায়। উজ্জ্বল দীপশিখা যখন আলোক বিতরণ করিতে থাকে, তখন বায়ুর অম্লজানই তৈলের নানা উপাদানের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাপের উৎপত্তি করে এবং এই তাপই প্রদীপ প্রজ্বলিত রাখে। কেবল দীপশিখায় নহে, যেখানে অগ্নি সেখানেই বায়ুর অম্লজান পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দহন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে থাকে। সুতরাং যেখানে বায়ু নাই, সেখানে দহনও নাই, এই জন্যই বায়ুহীন স্থানে কোন পদার্থকে দগ্ধ করা যায় না। একটি দীপ কোন পাত্র দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিলে যতক্ষণ পাত্রের আবদ্ধ বায়ুর অম্লজান ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ তাহা জ্বলিতে থাকে। অম্লজান নিঃশেষ হইয়া গেলেই প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।

বায়ুর যবক্ষারজান-নামক উপাদানটির কার্য্য স্বতন্ত্র। যখন অগ্নি অত্যন্ত প্রবলভাবে জ্বলিতে আরম্ভ করে, তখন ইচ্ছা করিলে ধূলি বা ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া আমরা তাহা নির্ব্বাপিত করিতে পারি। ধূলি বা ভস্ম কোনটিই দাহ্য পদার্থ নহে, সেই জন্য এগুলি অগ্নি আচ্ছাদিত করিয়া তাহার তেজঃ নষ্ট করে। বায়ুর যবক্ষারজান উদাহৃত ধূলি বা ভস্মের ন্যায়ই অগ্নির তেজঃ প্রশমিত করে। বায়ুতে যদি কেবলই অম্লজান থাকিত, তাহা হইলে দহনকার্য্য এত শীঘ্র সম্পন্ন হইত যে, আমরা কোন কার্য্যে অগ্নির ব্যবহার করিতে পারিতাম না।

শ্বাসের সহিত আমরা যে বায়ু গ্রহণ করি,তাহাও প্রকারান্তরে

ধীরে ধীরে দেহে আর একপ্রকার দহনকার্য্যের সূচনা করে। ইহা দেহপ্রবিষ্ট হইয়া যখন দেহস্থ অন্যান্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত হয়, তখন এই দহনের সূত্রপাত হয়। ইহাতে অগ্নি উৎপন্ন হয় না বটে, কিন্তু যথেষ্ট তাপ জন্মে। প্রাণিদেহে সর্ব্বদাই যে তাপ বিদ্যমান, তাহা এই প্রকার ধীর দহনেরই তাপ। বায়ুতে যবক্ষারজান না থাকিলে শরীরের তাপ এত অধিক হইত যে, আমরা জীবনধারণ করিতে পারিতাম না।

কোন পদার্থেরই ধ্বংস নাই। অদ্য ঝটিকায় যে বৃক্ষটী উন্মূলিত হইয়া ভূশায়ী হইল, উহাকে তদবস্থায় দীর্ঘকাল রাখিলে সম্ভবতঃ তথায় উহার কোন অংশেরই সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কিন্তু ইহা দেখিয়াই বৃক্ষের সকল অংশ ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল হইবে। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বৃক্ষের একটি অণুরও ধ্বংস হয় না। উহার জলীয় অংশ সূর্য্যের তাপে বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয় এবং কঠিন অংশ নানা আকার গ্রহণ করিয়া মৃত্তিকাতেই অবস্থান করে। কেবল বৃক্ষ নয়, চেতন অচেতন সকল বস্তুই এই স্বাভাবিক নিয়মের অধীন। যখন কোন বস্তুকে আমরা অন্তর্হিত হইতে দেখি, তখন বুঝিয়া লইতে হয় যে, তাহার কোন অংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই, রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে মাত্র।

দাহ্যপদার্থের সহিত বায়ুর অম্লজান মিশ্রিত হইয়া যখন অগ্নি বা তাপের উৎপত্তি করে, তখন ইহারও ধ্বংস হয় না। বায়ুর

অম্লজান দাহ্যপদার্থের অঙ্গারের সহিত মিশ্রিত হইয়া অঙ্গারক-বাষ্পের উৎপত্তি করে। অঙ্গারকবাষ্প স্বাস্থ্যরক্ষার অনুকূল নহে। শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে ইহা বিষবৎ কার্য্য করে এবং অধিক বাষ্প দেহস্থ হইলে প্রাণিমাত্রই হতচেতন হইয়া শেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, শত শত বৎসর ধরিয়া প্রতিদিনই কল-কারখানায় ও গ্রামনগরে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকায়, বায়ুর অম্লজান বিকৃত হইয়া যে রাশি রাশি অঙ্গারকবাষ্প উৎপন্ন করিতেছে, তাহা কি বায়ুরাশিকে অস্বাস্থ্যকর করিতেছে না? বৈজ্ঞানিকগণ ইহার উত্তরে যাহা বলেন, তাহা অতীব বিস্ময়কর। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, অগ্নি-প্রজ্বলনে এবং কোটি কোটি প্রাণীর নিঃশ্বাসে নিয়তই যে অঙ্গারক-বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে, তাহা বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হইতে পারে না। ভূমণ্ডলের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল উদ্ভিদই বায়ু হইতে এই বিষাক্ত বাষ্প শোষণ করিয়া লয়, এবং কিয়ৎকাল পরে তাহারই পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ অম্লজান বায়ুতে প্রত্যর্পণ করে। এই ব্যবস্থায় কোন প্রকারে কদাপি বায়ুমণ্ডলে অঙ্গারকবাষ্পের আধিক্য হইতে পারে না। শতবৎসর পূর্ব্বে বায়ু যেমন নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল, লক্ষ লক্ষ কল-কারখানার চুল্লীতে অবিরাম অগ্নি প্রজ্বলিত থাকা সত্ত্বেও, এখন তাহা সেই প্রকারই নির্ম্মল ও স্বাস্থ্যকর আছে।

বায়ুর অম্লজানের অঙ্গারকবাষ্পে পরিণতি এবং সেই

অঙ্গারকবাষ্প হইতে উদ্ভিদের সাহায্যে আবার অম্লজানের পুনরাবির্ভাব, যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়াই আজ জগৎ এত সুন্দর। ইহা যেন বিশ্বশিল্পীর কর্ম্মশালাস্থ চক্রের আবর্ত্তন। প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে এইরূপে সহযোগিতার প্রতিষ্ঠা করিয়া পরমেশ্বর কত সহজে সৃষ্টিরক্ষা করিতেছেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক্ হইতে হয়।

শ্বাসের সহিত দেহস্থ হইয়া বায়ু কি প্রকারে প্রাণীদিগের জীবনধারণের সহায় হয়, এবং উদ্ভিদ্সমূহ বায়ুর অঙ্গারকবাষ্প গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে জীবিত থাকে ও বায়ু বিশুদ্ধ রাখে, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লৌহ-প্রভৃতিতে মরিচা উৎপন্ন করিয়া ও নানা দাহ্য পদার্থের দহনে সাহায্য করিয়া বায়ু কি প্রকারে ক্ষয়কার্য্যের সহায় হয়, তাহারও আভাস পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত সমগ্র ভূখণ্ড ব্যাপিয়া বায়ুর যে আর একটি কার্য্য নিয়তই ভূভাগের রূপান্তর সাধন করিতেছে, তাহাও উল্লেখযোগ্য।

সূর্য্যের তাপে ও বৃষ্টির জলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে শিলা নিয়তই চূর্ণ হইয়া মৃত্তিকায় পরিণত হইতেছে। এই নূতন মৃত্তিকার উর্ব্বরতা অত্যন্ত অধিক। কিন্তু উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশে জন্মিয়া তাহা সেই স্থানে অবস্থান করিলে তদ্দ্বারা আমাদের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার হয় না, বরং অপকারই হয়, কারণ নিম্নস্তরের শিলা পূর্ব্ব মৃত্তিকারাশিতেই আবৃত থাকিয়া আর নূতন মৃত্তিকা উৎপাদন করিতে পারে না। বৃষ্টির জল চূর্ণীকৃত শিলা বহন করিয়া

নিম্ন স্থানকে উচ্চ করে, এবং বৃষ্টির অনুপস্থিতিতে বায়ুই প্রবল-ভাবে প্রবাহিত হইয়া তাহা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। বায়ুপ্রবাহের এই কার্য্য ভূপৃষ্ঠের যে কত পরিবর্ত্তন সাধন করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা যে জীবজগতের কত উপকার হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মূল্যপ্রাপ্তি।

অঘ্রাণে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।
সুদাস মালীর ঘরে কাননের সরোবরে
একটী ফুটেছে কি করিয়া।
তুলি লয়ে বেচিবারে গেল সে প্রাসাদ-দ্বারে,
মাগিল রাজার দরশন,—
হেন কালে হেরি ফুল আনন্দে পুলকাকুল
পথিক কহিল একজন ঃ—
"অকালের পদ্ম তব আমি এটি কিনি লব
কত মূল্য লইবে ইহার ?
বুদ্ধ ভগবান্ আজ এসেছেন পুরমাঝ
তাঁর পায়ে দিব উপহার।"
মালি কহে "এক মাষা স্বর্ণ পাব মনে আশা"—
পথিক চাহিল তাহা দিতে,—
হেন কালে সমারোহে বহু পূজা অর্ঘ্য ব'হে
নৃপতি বাহিরে আচম্বিতে।
রাজেন্দ্র প্রসেনজিত উচ্চারি মঙ্গলগীত
চলেছেন বুদ্ধ-দরশনে—

হেরি অকালের ফুল, সুধালেন, "কত মূল ?
কিনি দিব প্রভুর চরণে।"
মালী কহে "হে রাজন্! স্বর্ণমাষা দিয়ে পণ
কিনিছেন এই মহাশয়।"
"দশমাষা দিব আমি"— কহিলা ধরণী-স্বামী,
"বিশমাষা দিব"—পান্থ কয়।
দোঁহে কহে—দেহ দেহ, হার নাহি মানে কেহ,
মূল্য বেড়ে ওঠে ক্রমাগত।
মালী ভাবে যাঁর তরে এ দোঁহে বিবাদ করে
তাঁরে দিলে আরো পাব কত!
কহিল সে করযোড়ে দয়া করে ক্ষম মোরে—
এ ফুল বেচিতে নাহি মন।
এত বলি ছুটিল সে যথা রয়েছেন ব'সে
বুদ্ধ দেব উজলি' কানন।
বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দ-মূরতি ;
দৃষ্টি হ'তে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি,— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।
সহসা ভূতলে পড়ি পদ্মটি রাখিল ধরি
প্রভুর চরণপদ্ম'পরে

বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ সুধালেন হাসি—
"কহ বৎস! কি তব প্রার্থনা?"
ব্যাকুল সুদাস কহে— "প্রভু! আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা।"

বঙ্গবন্ধু উইলিয়ম্ কেরী।

ইংরেজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠার পরে যে সকল কল্যাণব্রত উদার-প্রাণ ইংরেজ বঙ্গদেশে বাস করিয়া বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারে সাহায্য করিয়াছিলেন, মহাত্মা উইলিয়ম কেরী তাঁহাদের অন্যতম।

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের এক দরিদ্রপরিবারে উইলিয়ম্ কেরী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বস্ত্রবয়ন করিয়া অতি-কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শৈশবেই পুত্রের অদম্য জ্ঞানলাভেচ্ছা দর্শন করিয়া, তিনি তাঁহাকে স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু অধিককাল পুত্রের পাঠের ব্যয়ভার বহন করিতে অসমর্থ হইয়া, দারিদ্র্যপীড়িত পিতা পুত্রকে শ্রমজীবীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। বৃদ্ধ মাতাপিতার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করা পুত্রের প্রথম কর্ত্তব্য মনে করিয়া, কেরী বৃষ্টিবাত্যা অগ্রাহ্য করিয়া কৃষিক্ষেত্রে হলচালনায় প্রবৃত্ত হইলেন জ্ঞানলাভেচ্ছার

উদ্রেক হইলে, তাহার শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত মানব সুখভোগ করিতে পারে না। দিবসব্যাপী শ্রমের পরে সন্ধ্যায় অবসন্নদেহে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কেরী পাঠাভ্যাস করিতেন।

এইরূপ কঠোর শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে কেরীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া এক চর্ম্মকারের গৃহে পাদুকানির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে তাঁহার পাঠাভ্যাসের কিঞ্চিৎ সুযোগ উপস্থিত হইল। তিনি সম্মুখে পুস্তক উন্মুক্ত রাখিতেন এবং অধ্যয়ন ও উচ্চ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হস্ত দ্বারা কার্য্য করিতেন। প্রভুর গৃহে একখানি ছিন্ন "বাইবেল" ছিল। "বাইবেল" খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ। অপর পাঠ্যগ্রন্থের সহিত এই ধর্ম্মগ্রন্থখানিও কেরী পাঠ করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে খৃষ্টধর্ম্মের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিলেন এবং তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, যে ব্যক্তি পাপিতাপীর নিকটে ধর্ম্মকথা প্রচার করে, তাহারই জন্ম সার্থক। এই সময়ে তাঁহার উদার হৃদয়ে যে লোকহিত-সাধনস্পৃহার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা তাঁহার জীবনের শেষদিন-পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে দিবাভাগে স্বহস্তনির্ম্মিত পাদুকা স্কন্ধে লইয়া দূরবর্ত্তী নগরে ও গ্রামে ক্রেতার অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে হইত। অথচ তাঁহার জ্ঞানদান-স্পৃহা এতদূর প্রবল ছিল যে, তিনি রাত্রিযোগে স্বগ্রামস্থ নৈশ-বিদ্যালয়ের অল্পশিক্ষিত কৃষকযুবকদিগকে ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ে উপদেশ প্রদান

মহাত্মা উইলিয়ম্ কেরী

করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ ছিল, নিজের একটি কন্যার মৃত্যুদিনেও তিনি সহাস্যবদনে গ্রামবাসীদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন। বস্তুতঃ এইরূপ ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

যাহা হউক, এই প্রকারে নানারূপ প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া উইলিয়ম্ কেরী নানাভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অর্দ্ধাশনে থাকিয়াও প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিবার জন্য অর্থসঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে কেরীর নির্ম্মল চরিত্র, অদম্য জ্ঞানলাভেচ্ছা ও অসামান্য ধর্ম্মজ্ঞানের কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইলে, কোন ধর্ম্মযাজক এক গ্রাম্য ভজনালয়ে প্রচারকার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কেরী এই আহ্বানকে ঈশ্বরের আদেশবাণী মনে করিয়া বার্ষিক দশ পাউণ্ড, অর্থাৎ দেড়শত টাকা বেতনে ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময়ে নানাগ্রন্থে ভারতবর্ষের বিবরণ পাঠ করিয়া, ভারতবর্ষকেই কর্ম্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করিবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা কেরীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। তিনি ভারতে আসিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের শাসনভার তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত ছিল। কোম্পানী সহজে কাহাকেও এ দেশে আগমন করিতে দিতেন না। ভারতাগমনের চেষ্টা পুনঃ পুনঃ বিফল হইতেছে দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। শেষে তিনি একখানি দিনে-

মার জাহাজের আরোহী হইয়া পত্নীপুত্রসহ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে—৩৩ বৎসর বয়সে—ভারতে পদার্পণ করেন। তৎকালে সুয়েজ খাল ছিল না। ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসিতে কেরীর প্রায় পাঁচ মাস লাগিয়াছিল।

এই সুদীর্ঘ কাল তিনি বঙ্গভাষাশিক্ষায় ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে ইংরাজের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প ছিল। কেরী রিক্তহস্তে আত্মীয়বন্ধুহীন নূতন দেশে আসিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিলেন। কি প্রকারে স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণ করিবেন, এই দুর্ভাবনা তাঁহাকে কিছুদিনের জন্য আকুল করিয়াছিল। কিন্তু যাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ, পরমেশ্বরই তাঁহাদের সহায় হন। কিয়ৎকালমধ্যে মালদহ জেলায় মদনাবতী-নামক স্থানে এক নীলকুঠির কার্য্যাধ্যক্ষের পদ হঠাৎ শূন্য হওয়ায়, কেরী মাসিক দুইশত টাকা বেতনে সেই পদে নিযুক্ত হইলেন।

কুঠির কার্য্য শেষ করিয়া কেরী যথেষ্ট সময় পাইতেন; এবং সেই অবসরে বাঙ্গালাভাষার চর্চ্চা করিতেন। তখন বাঙ্গালাভাষার কোন ভাল ব্যাকরণ ছিল না। কেরী বাঙ্গালা ভাষায় কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াই এই অভাবপূরণে মনোনিবেশ করিলেন। বিদেশীয়ের পক্ষে ইহা অসাধারণ ধীশক্তির পরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতি অল্পকালের মধ্যে কেরী সংস্কৃতভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন; তিনি সংস্কৃতে ও বাঙ্গালায় বাইবেলের অনুবাদ করেন।

মালদহ-জেলার জলবায়ু তখন ভাল ছিল না। কেরীর একটি পুত্র জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিলে, তিনি পত্নীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে মালদহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর-নামক স্থানে আগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময়ে ওয়াড´ এবং ম্যার্শম্যান্-নামক অপর দুইজন ধর্ম্মপ্রাণ প্রচারক এদেশে আগমন করেন। কেরীর দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া ইঁহারাও বঙ্গভাষার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হন। এই তিন মহাত্মা বঙ্গভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান প্রণয়ন করিয়া এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যে সাহায্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য বাঙ্গালীগণ তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। ইঁহারা স্বহস্তে কাষ্ঠ ও ধাতুফলকে বাঙ্গালা অক্ষর খোদিত করিয়া প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রা-যন্ত্রালয় স্থাপন করেন।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে যে সকল দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতেছে, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেরূপ একখানিরও অস্তিত্ব ছিল না। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কেরী এবং মার্শম্যান সাহেব বাঙ্গালা ভাষায় ‘দিগ্‌দর্শন’-নামক প্রথম মাসিকপত্র প্রকাশিত করেন। প্রথম বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র “সমাচারদর্পণ”ও মহাত্মা কেরী সাহেবের চেষ্টায় প্রকাশিত হয়।

এ দেশে নিরক্ষর ও অশিক্ষিত কৃষিজীবিগণের মধ্যে বিজ্ঞানানুগত প্রথায় কৃষিকার্য্য প্রবর্ত্তন করা কর্ম্মবীর কেরী সাহেবের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। নানাদেশ হইতে

বৃক্ষ ও বীজ সংগ্রহ করিয়া, তিনি শ্রীরামপুরে একটি আদর্শ উদ্যান ও কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে দেশীয় সমাজের নানারূপ সংস্কার-কার্য্যেরও সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের জুন-মাসে মহাত্মা কেরী শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন। আজিও শ্রীরামপুরে রাজপথের পার্শ্বস্থ কেরী সাহেবের সমাধিস্তম্ভটি বঙ্গবাসীদিগকে তদীয় উদার হৃদয়, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা এবং বিপুল পাণ্ডিত্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। কালে ঐ স্মৃতিস্তম্ভ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু যতকাল বঙ্গভাষা থাকিবে ততকাল ঐ ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান ও সংবাদপত্রসমূহ তাঁহার স্মৃতি-স্তম্ভের কার্য্য করিবে।
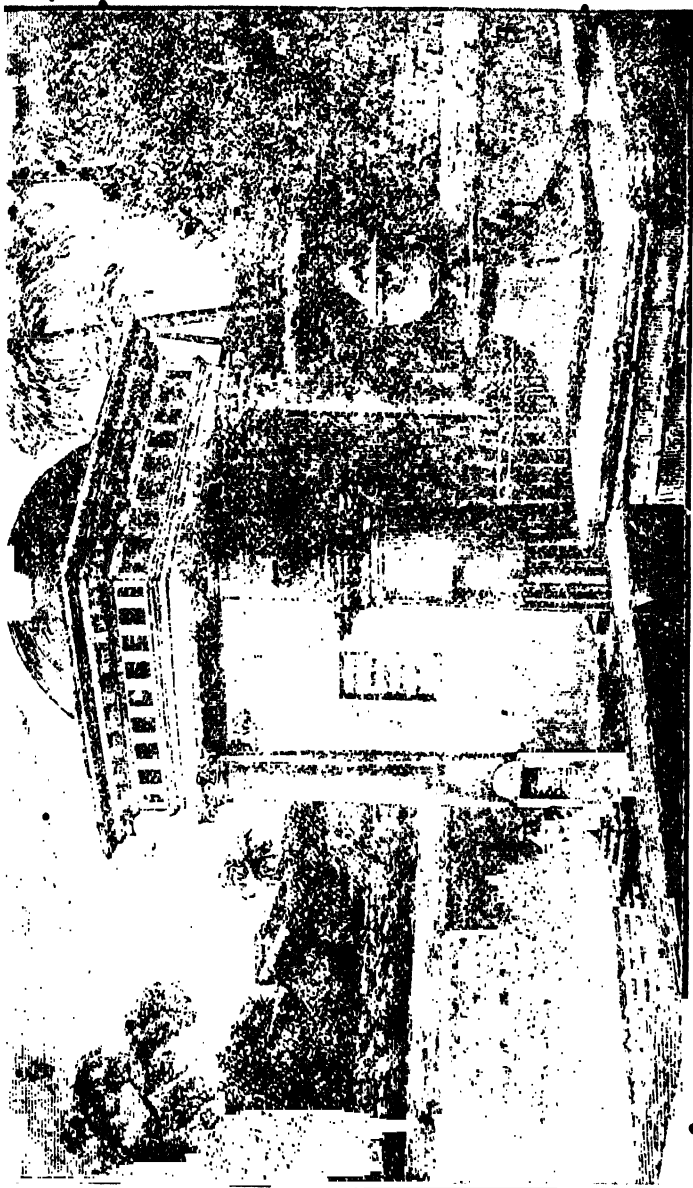
কেরী সাহেবের সমাধিস্তম্ভ।

মক্কানগরীর প্রতিষ্ঠা।

মুসলমানদিগের ধর্ম্মগুরু মহাত্মা হজরত মহম্মদ আরবদেশে মক্কানগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অধুনা প্রতিবৎসর জগতের সহস্র সহস্র মুসলমান তীর্থদর্শনমানসে পুণ্যভূমি মক্কানগরীতে গমন করিয়া থাকেন। হজরত মহম্মদের জন্মের সার্দ্ধদ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই নগরীর চিহ্নমাত্র ছিল না।

কথিত আছে, হজরত মহম্মদের পিতৃপুরুষগণের বংশে এব্রাহিম নামক জনৈক মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই স্ত্রী—সারা ও হাজেরা। পিতৃহৃদয়ের সমস্ত স্নেহরাশি হাজেরার পুত্র ইস্মাইল সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিলেন। সপত্নীপুত্রের প্রতি স্বামীর এরূপ স্নেহাধিক্য দর্শন করিয়া সারা শিশুটীর বিরুদ্ধে নানা কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। এই কুমন্ত্রণার ফলে এব্রাহিম, পত্নী হাজেরা ও পুত্র ইস্মাইলের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং উভয়কে আধুনিক মক্কার নিকটবর্ত্তী জনশূন্য মরু প্রান্তরে নির্ব্বাসিত করিলেন; নির্ব্বাসনকালে কিছু খোরমা ফল ও কয়েকটী জলপূর্ণ পাত্র তাহাদের সঙ্গে দিলেন।

চারিদিকে জলশূন্য তপ্তবালুকাময় সীমাহীন প্রান্তর;—কোন স্থানে জলাশয়, বা আতপতাপে তাপিত পথিকের বিশ্রামের জন্য একটীও ছায়াতরু, কিংবা জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্র নাই।

নির্ব্বাসিতা হাজেরা একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র ইস্‌মাইলকে আপন স্নেহময় বক্ষে ধারণ করিয়া একাকিনী এই ভীষণ নির্জ্জন প্রান্তরে বসিয়া ভগবান্‌কে স্মরণ করিতে লাগিলেন। প্রতিমুহূর্ত্তেই শিশুর জীবননাশের আশঙ্কা জননীর হৃদয়ে প্রবলতর হইতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যেই সঙ্গে যে পানীয় জল ছিল, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন মাতা-পুত্রের তৃষ্ণানিবারণেরও কোন উপায় রহিল না।

মনুষ্যের অদৃষ্ট যখন অপ্রসন্ন হয়, তখন চারিদিকে বিপদ্‌-রাশি যেন ঘনীভূত হয়। হাজেরা পিপাসায় অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শিশুপুত্রের প্রাণও প্রায় ওষ্ঠাগত হইল। শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া জল অন্বেষণ করাও সুসাধ্য নহে। উভ-য়ের শরীর ক্রমেই দুর্ব্বল এবং তৎসঙ্গে তৃষ্ণা প্রবলতর হইতে লাগিল ; হাজেরা কাতরপ্রাণে ঈশ্বরের নিকট করুণাভিক্ষা করিলেন এবং দুঃখের ধন একমাত্র শিশুপুত্রটীকে তাঁহারই আশ্রয়ে রাখিয়া জলান্বেষণে বহির্গত হইলেন।

অবসন্নদেহে চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে কিঞ্চিৎদূরে নিভৃত স্থানে একটী নির্ঝর দেখিতে পাইয়া হাজেরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে ঈশ্বরোদ্দেশে মস্তক অবনত করিলেন এবং তাঁহার নয়নপ্রান্ত হইতে অজস্র অশ্রুধারা তপ্তবালুকাময় ভূমিতে পতিত হইতে লাগিল। হাজেরার মনে হইল যেন পরমেশ্বরের করুণাধারাই দুঃসময়ে অনাথার জীবনরক্ষার জন্য নির্ঝরাকার ধারণ করিয়াছে। সেই জন্য নির্ঝরটি তাঁহার কাছে এক রমণীয়

মক্কা ।
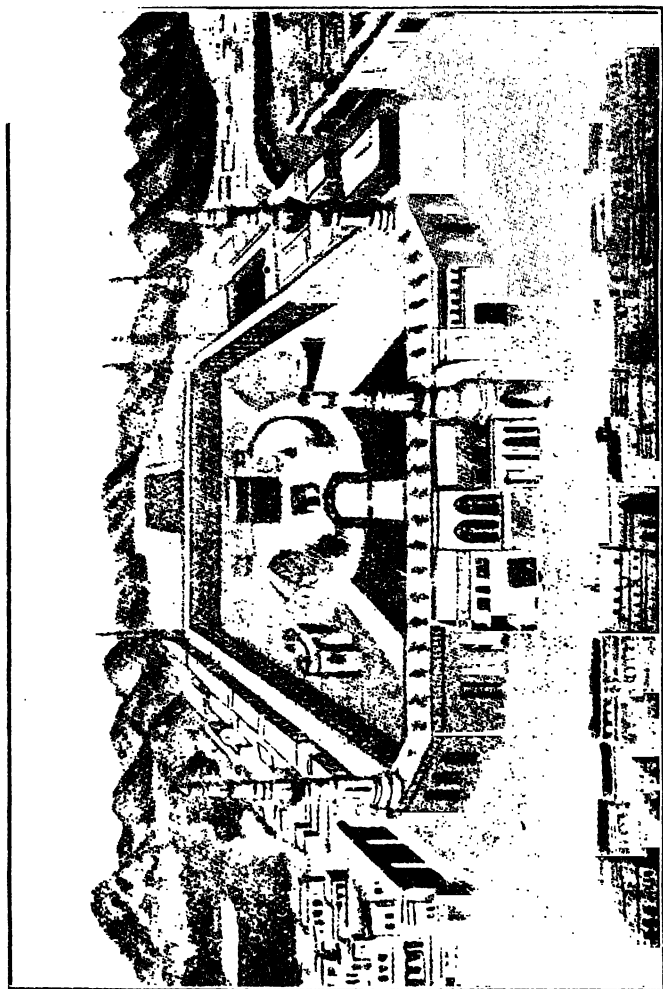
পুণ্যতীর্থ বলিয়া মনে হইল। তাঁহার দুঃখভারাক্রান্ত অবশ হৃদয় এই নির্ঝরতীর একমাত্র বিশ্রামস্থান বলিয়া স্থির করিয়া লইল।

অতঃপর হাজেরা শিশু-পুত্রকে লইয়া এই নির্ঝর সমীপ-বর্ত্তী এক তরুতলে বাস করিতে লাগিলেন। একদা একদল বণিক্ এই স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। প্রখর সূর্য্যকিরণে ক্লান্ত ও তৃষ্ণাতুর হইয়া তাঁহারা নির্ঝরতীরে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন এবং তথায় সাধ্বী হাজেরার শান্তোজ্জ্বল সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা বিস্ময়াভিভূত হইলেন। সকলের মনেই রমণীর পরিচয় জানিবার অগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিল। কিন্তু কেহই সেই তেজোময়ী নিশ্চলা প্রতিমার সম্মুখে অগ্রসর হইতে সাহস করিলেন না। বহুক্ষণ পরে তাঁহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আপনি কে?" তপস্বিনী শান্তভাবে উত্তর করিলেন, "বাবা, আমি অনাথা মানবী। আমার স্বামী এই শিশুটীর সহিত আমাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন; সংসারে আমি একান্ত নিরাশ্রয়া।"

বণিক্‌সম্প্রদায় মরুমধ্যে এই রমণীয় স্থান দর্শন করিয়া তথায় বসতি-স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহাদের মনে হইল, হাজেরা মানবী-বেশধারিণী দেবী। তাঁহারা এই নির্ঝরের নিকটে অবস্থান করিবার জন্য হাজেরার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। হাজেরা সানন্দে কহিলেন, "তোমরা এখানে যথেচ্ছ ভূমি গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু এই নির্ঝরসন্নিহিত স্থানটুকু আমার অধিকারে রাখিও। নিতান্ত দুঃখের সময়ে আমি এই নির্ঝরটী

দয়াময় বিধাতার অনন্ত করুণার নিদর্শনরূপে লাভ করিয়াছি; ইহাই আমাদের ম্রিয়মাণদেহে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে।”

বণিক্‌সম্প্রদায় সাধ্বী হাজেরার কথার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া নির্ঝর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গৃহ-নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পুণ্যবতী হাজেরাকে যথেষ্ট ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন; এবং তাঁহার সমীপে বাস করিতে পারিয়া আপনাদিগকে পরম সৌভাগ্যবান্ মনে করিতেন। তাঁহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিশু ইস্‌মাইল ও তাঁহার জননীর প্রতিপালনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই মক্কানগরী-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত হয় এবং উত্তরকালে এই সাধ্বী রমণীর বংশেই ইস্‌লামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক মহাত্মা হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরের অসীম করুণার উপর একান্তভাবে নির্ভর করিতে পারিলে নদীসরোবরহীন মরুপ্রান্তরেও নির্ঝরের আবির্ভাব হয়, এবং জনহীন ভীষণ কান্তারেও সহায় আসিয়া দেখা দেয়।

শরতের বঙ্গ।

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে।
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ,
ঝলিছে অমল শোভাতে।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর,
ডাকিছে দোয়েল গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে,
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
শরৎকালের প্রভাতে!

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে,
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে!
অবসর আর নাহিক তোমার
আটি আটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে।
জননি, তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে।

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরণী,
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
নানা দেশ হ'তে তরণী!
আকাশ করেছ সুনীল অমল
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী!

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য
গন্ধে ভরিছে অবনী,
জল-হারা মেঘ আঁচলে খচিত,
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হিরণে
কুসুম-ভূষণ-জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী!
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

নীতি-কথা।

(১) আমলকখণ্ড।

রাজর্ষি অশোকের তুল্য ধর্ম্মপরায়ণ ও দানশীল ভূপতি জগতের ইতিহাসে বিরল। ধর্ম্ম ও সুনীতির বহুল প্রচার দ্বারা মানব-সমাজের ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গল-সাধন তদীয় জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। সমগ্র এসিয়া মহাদেশ তাঁহার এই পুণ্যব্রতের সুধাময় ফল ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারের জন্য হিমগিরি হইতে সিংহল-পর্য্যন্ত ভারত-বর্ষের সর্ব্বাংশে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে পারস্য, এশিয়া-মাইনর, তিব্বত, চীন-প্রভৃতি নানাদেশে বহু প্রচারক প্রেরণ করিয়া-ছিলেন।

বিবিধ মঙ্গলানুষ্ঠানের নিমিত্ত অশোক মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার অর্থে আতপ-তাপিত পথিকের জন্য পথি-পার্শ্বে ছায়াতরুসমূহ রোপিত ও বহু বিশ্রামভবন নির্ম্মিত হইয়া-ছিল এবং ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় মানব ও গৃহপালিত পশুদিগের নিমিত্ত দেশের সর্ব্বত্র দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

অতুলপ্রতাপান্বিত ভূপতি হইয়াও তিনি ভোগবিলাস বিস-র্জ্জন করিয়া ভিক্ষুর ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করিতেন না, কিন্তু ভিক্ষুর ন্যায় কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়াই রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ইৎসিং অশোকের মৃত্যুর প্রায় সহস্র বৎসর পরে

ভারত-ভ্রমণ-সময়ে ভিক্ষুবেশধারী অশোকের নানা খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়াছিলেন।

তাঁহার পুণ্যজীবনের কার্য্যাবলী আলোচনা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ধর্ম্মের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগবশতঃ তিনি তাহার উন্নতিবিধানের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। পুত্র, কলত্র, বিত্ত, রাজপদ, এমন কি, প্রাণ-অপেক্ষাও ধর্ম্ম তাঁহার প্রিয়তর ছিল। কথিত আছে, ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র মহেন্দ্র ও প্রিয়তমা দুহিতা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। রাজকুমার ও রাজকুমারী আজীবন ভিক্ষুধর্ম্ম আচরণ করিয়া ধর্ম্ম ও সুনীতি প্রচার করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল বিস্তারের নিমিত্ত তিনি অজস্র অর্থদান করিতেন। তাঁহার অপূর্ব্বদানশীলতা-সম্বন্ধে অনেক আখ্যান প্রচলিত আছে। তাহাদের একটি এইরূপ ;—বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে অশোক দশকোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় করিবেন, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বৃদ্ধবয়সে যখন তিনি রাজকার্য্য হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলেন, তখন ধর্ম্মার্থে তাঁহার মাত্র নয়কোটি ষাটলক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছে ; সেইজন্য তখনও তিনি প্রতিদিন রাজভাণ্ডার হইতে প্রভূতপরিমাণ রজত ও কাঞ্চন “কুক্কুটারাম”-নামক প্রসিদ্ধ ভিক্ষুনিবাসে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার পৌত্র সম্পদি যুবরাজ ছিলেন। মন্ত্রিবর্গ তাঁহাকে জানাইলেন যে, মহারাজ অশোকের অমিতদানে রাজভাণ্ডার অবিলম্বে শূন্য হইবে

এবং তিনি অর্থবলহীন হইয়া অদূরভবিষ্যতে এমন হীনাবস্থাপন্ন হইবেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণ রাজ্য আক্রমণ করিলে কোনক্রমেই তাঁহার জয়ী হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না।

যুবরাজ এই কথা শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। রাজার আদেশানুসারে অর্থব্যয় করিতে কোষাধ্যক্ষকে নিষেধ করিলেন। এইরূপে রাজকোষ হইতে অর্থপ্রাপ্তির পথ রুদ্ধ হইলেও অশোক সঙ্কল্পিত দানকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি স্বগৃহ হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত পাত্রগুলি একটি একটি করিয়া ভিক্ষু নিবাসে পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার অন্তঃপুরে কাঞ্চন রৌপ্য, এমন কি, লৌহপাত্রগুলিও নিঃশেষ হইল।

যখন অশোকের দান করিবার আর কিছুই রহিল না, তখন তিনি শোকসন্তপ্ত চিত্তে মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"অমাত্যগণ, এই রাজ্যের রাজা কে ?"

সচিবগণ অবনতমস্তকে উত্তর করিলেন, "প্রভো, আপনিই এই রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর।"

মন্ত্রিগণের এইরূপ প্রতিবচন শ্রবণ করিয়া অশোক অশ্রুপূর্ণনেত্রে কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "না, না, তোমরা শিষ্টাচারপ্রদর্শনের জন্য আর আমাকে রাজা বলিয়া কীর্ত্তন করিও না, আমি রাজগৌরব হইতে বিচ্যুত হইয়াছি। তোমরা একবার চাহিয়া দেখ, ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিবার জন্য এই অর্দ্ধখণ্ড আমলক ব্যতীত সম্রাট্ অশোকের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই।"

এই বলিয়া অশোক সেই আমলকখণ্ড ভিক্ষুদিগকে প্রদান

করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন—"এই আমলকখণ্ডই 'ভিক্ষুসঙ্ঘে আমার শেষদান। আপনারা সকলে এই শেষদানের অংশ গ্রহণ করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। রাজশ্রী ও রাজশক্তি আমাকে এ জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার' স্বাস্থ্য ভগ্ন এবং শরীর শীর্ণ হইয়াছে; আত্মীয়গণের প্রণয় ও স্বজন-বর্গের সাধু ব্যবহারে আমি আর অধিকারী নহি।"

ধর্ম্মভীরু রাজার এইরূপ পরিতাপবাক্যেও মন্ত্রিগণ রাজ-কোষ হইতে ধর্ম্মার্থে আর অর্থব্যয়ের কোনও ব্যবস্থা করিলেন না। কিন্তু অশোকের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, প্রজাগণের পারত্রিক মঙ্গলের জন্য যে ব্যয়, তাহা অপব্যয় নহে। ঐহিক ঐশ্বর্য্য অচিরস্থায়ী; ধর্ম্মই মানবের ক্ষণভঙ্গুর জীবনের পরম আশ্রয়। এইরূপ বিশ্বাসবশতঃ তিনি রাজকোষ হইতে অর্থপ্রাপ্তির জন্য এক কৌশল অবলম্বন করিলেন।

একদিন তিনি প্রধানসচিব রাধাগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মন্ত্রিবর, এই রাজ্যের অধীশ্বর কে?"

রাধাগুপ্ত যথোচিত সম্মানপ্রদর্শন-পূর্ব্বক সবিনয়ে নিবেদন করিলেন—"মহারাজ, আপনিই এই রাজ্যের প্রভু।"

অশোক মন্ত্রীর তাদৃশ প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া ধীরকণ্ঠে উত্তর করিলেন—"আমি যদি এই রাজ্যের অধীশ্বর, তবে এই বিবিধ-ধনরত্নশালিনী ভূতধাত্রী ধরণী ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করিলাম। জল-প্রবাহের ন্যায় চঞ্চল ঐশ্বর্য্য আমার অভিলষিত নহে, ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব আমি কামনা করি না। সাধুগণের চিরবাঞ্ছিত শান্তিই

আমার একমাত্র কাম্য। এই দান সেই অভীষ্ট-সাধনে আমার আনুকূল্য করুক।”

এই কথা বলিয়া তিনি যথারীতি দানপত্র স্বাক্ষর করিলেন। কথিত আছে যে, মহামতি অশোকের সঙ্কল্পিত দানের অবশিষ্ট চল্লিশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ভিক্ষুসঙ্ঘকে প্রদান করিয়া মন্ত্রিবর্গ অশোকদত্ত রাজ্য পুনর্ব্বার সম্পদির জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন।

(২) দয়ার পুরস্কার।

সবুক্তগীন আফগানিস্থানের অধীশ্বর ছিলেন ; শৌর্য্যে, বীর্য্যে ও ঔদার্য্যে তাঁহার নাম আফগানিস্থানের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ইনি ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখনও এ দেশ মুসলমানগণকর্ত্তৃক বিজিত হয় নাই। সবুক্তগীনের সহিত রাজপুতদিগের কয়েকবার ঘোর যুদ্ধ হয়।

সবুক্তগীন দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা হইলেও তাঁহার অন্তঃকরণ কমনীয় গুণরাজিতে মণ্ডিত ছিল। মহাসমুদ্রের বিশাল বক্ষে যেরূপ নানাপ্রকার ভীষণ জলজন্তু ও বহুমূল্য রত্নরাজি একত্র অবস্থান করে, এই নরপতির অন্তঃকরণেও সেইরূপ একদিকে বীরজনোচিত কঠোর গুণাবলি এবং অপর দিকে দয়াদাক্ষিণ্য-প্রভৃতি কোমল গুণসমূহের একত্র সমাবেশ হেতু তিনি সকলশ্রেণীর লোকের বরণীয় হইয়াছিলেন।

কথিত আছে, সমগ্র আফগানিস্থানের প্রভুত্বলাভ করিবার

পূর্ব্বে সবুক্তগীন একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যজাতির নেতা ছিলেন। পর্ব্বতবিহারী জাতিসমূহ প্রায়ই অত্যন্ত দরিদ্র হয়, সবুক্তগীন দলপতি হইলেও এরূপ নিঃস্ব ছিলেন যে, তাঁহার একাধিক ঘোটক ছিল না। তিনি মৃগয়া দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

একদিন মৃগয়াকালে সবুক্তগীন একটি ক্ষুদ্র মৃগশিশু লাভ করেন। ঐ মৃগশিশুর মাতা তখন অদূরে নিশ্চিন্তমনে বিচরণ করিতেছিল। অশ্বের পদশব্দ কর্ণগোচর হইলে মৃগী ফিরিয়া দেখিল যে, তাহার প্রাণাধিক প্রিয় সন্তানটিকে একজন বীরপুরুষ অশ্বপৃষ্ঠে উঠাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিতেছে। ঐ বীরপুরুষের পৃষ্ঠে তুণীর ও হাতে ধনুর্ব্বাণ দেখিয়াও সন্তানের মমতায় মৃগী নিজ জীবনের মমতা না করিয়া, দরিদ্র যেরূপ ভিক্ষার্থী হইয়া সকরুণনয়নে ধনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়, সেইরূপ সবুক্তগীনের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। বিপন্ন শিশুর অমঙ্গলচিন্তায় অধীরা মৃগীর অবস্থা দর্শন করিয়া, সবুক্তগীনের স্বভাবকোমল হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইল, তিনি মৃগশিশুটিকে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং সেও এক দৌড়ে মাতার নিকটে উপস্থিত হইল। তখন দৈন্যের পরিবর্ত্তে কৃতজ্ঞতার ছায়া মৃগীর চক্ষে প্রতিফলিত হইল; বোধ হইল যেন সে প্রাণ ভরিয়া সবুক্তগীনকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে। সবুক্তগীনের মৃগয়া সেদিন নিষ্ফল হইলেও মৃগীর মুখে তিনি যে বিশ্বমাতার পুণ্যচ্ছায়া অবলোকন করিয়াছিলেন, তাহা

তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত রহিল, এবং পুণ্যকর্ম্মজনিত আত্মপ্রসাদে তাঁহার হৃদয় এরূপ পূর্ণ হইল যে, পরদিনের উদর-চিন্তা তথায় প্রবেশ করিতে পারিল না।

সেই দিন নিশীথকালে সবুক্তগীন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি যেন এক অসীমশোভাময় রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন—সেখানে কেবল আনন্দ;—দুঃখের লেশমাত্র নাই। উজ্জ্বলাবয়ব পরীগণ তথায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এবং তাহাদের গাত্রের সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইতেছে। কিয়ৎকাল পরে পরীগণ তাঁহাকে এক মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত করিল; সবুক্তগীন বিস্ময়, আনন্দ ও ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া শুনিলেন, সেই মহাপুরুষ আর কেহ নহেন, স্বয়ং হজরত মহম্মদ। পয়গম্বর তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সবুক্তগীন, তুমি আজ মৃগীর প্রতি যে করুণা প্রকাশ করিয়াছ, তাহাতে জগতের এক-মাত্র অধীশ্বর খোদাতালা তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছেন। তাঁহার দরবারে তোমার নাম পৃথিবীর প্রধানতম রাজগণের নামের সঙ্গে একত্র উল্লিখিত হইয়াছে। তুমি অচিরেই একজন মহাপ্রতাপ-শালী রাজা হইবে। অদ্য তুমি মৃগী ও মৃগশিশুর প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছ, রাজপদ লাভ করিয়া প্রজাগণের প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিও। তাহা হইলে পরমেশ্বর তোমাকে স্বর্গেও রাজসুখে বঞ্চিত করিবেন না।

সবুক্তগীনের স্বপ্ন যে সফল হইয়াছিল, একথা বলা বাহুল্য।

(৩) দৃষ্টান্তের ফল।

(বৌদ্ধ "জাতক" গল্পমালা হইতে)

কাশীরাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক সুপ্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাহার এক অতি দুর্বিনীত পুত্র ছিল। সে শৈশব হইতেই দুষ্ট ছিল বলিয়া, সকলে তাহাকে "দুষ্ট কুমার" এই নাম দিয়াছিল। কিঞ্চিৎ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার দৌরাত্ম্য এতদূর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, সকলেই তাহা অসহ্য বোধ করিতে লাগিল। জ্ঞাতিবর্গ, অমাত্যগণ বা স্বয়ং মহীপতিও এই দুঃশীল ও দুষ্ক্রিয়াসক্ত কুমারকে দমন করিতে পারিলেন না। অমাত্যবর্গের সহিত নাগরিকগণও সুযোগ পাইলেই কুমারকে সদুপদেশ দিত, কিন্তু কুমার তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিত না। তাঁহারা ক্রোধপ্রকাশ করিয়া নিষেধ করিলেও কুমার সে দিকে দৃক্‌পাত করিত না। ব্রহ্মদত্ত পুত্রের ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন।

সেই সময়ে রাজ্যে এক অসীম-ধীশক্তি-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ-তনয় সংসারত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। একদিন সেই মনস্বী সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ঘটনাক্রমে তাঁহার সহিত মহারাজ ব্রহ্মদত্তের সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসীর অসামান্য প্রতিভার কথা মহারাজ ব্রহ্মদত্তের অবিদিত ছিল না। তিনি পরম আগ্রহসহকারে তাঁহাকে নিজ উদ্যান বাটিকাতে আহ্বান করিয়া কিয়ৎকাল তথায় বাস করিবার জন্য সানুনয়

অনুরোধ করেন। সন্ন্যাসী তাহাতে সম্মত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদত্ত সন্ন্যাসীর প্রতিভা দেখিয়া স্থির করিলেন যে, দুষ্ট কুমারের শিক্ষার ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করিবেন। তদনুসারে তিনি সন্ন্যাসীকে প্রাসাদে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে পুত্রকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "এই পুত্র আপনার; ইহার জীবনের ভবিষ্যৎ শুভাশুভের সমস্ত দায়িত্বও আপনার। আপনি ইহাকে সুবিনীত করিবার নিমিত্ত যথোচিত ব্যবস্থা করুন।"

রাজকুমারের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী তৎসহ উদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, এবং প্রথমে তাহার রুচি ও অভিপ্রায়ে বাধা না দিয়া বরং তাহার অনুবর্ত্তন করিতে লাগিলেন; এইরূপে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সৌহৃদ্য জন্মিল। ক্রমে কুমার সন্ন্যাসীর প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁহার বাক্যে আস্থাস্থাপন করিতে লাগিলেন।

একদিন সন্নাসী কুমারকে সঙ্গে লইয়া উদ্যানমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটি নিম্ববীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এবং তাহার দুই দিকে দুইটি ক্ষুদ্র পত্র বহির্গত হইয়াছে। তিনি কুমারকে বলিলেন—"কুমার, একবার দেখ ত ইহার রস কিরূপ?" কুমার একটী পত্র ছেদনপূর্ব্বক রসনাগ্রে নিক্ষেপ করিয়াই ঘোরতর তিক্তস্বাদ অনুভব করিয়া, তাহা ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার বমনের উপক্রম হইল। সন্ন্যাসী কহিলেন—"কুমার, এ কি?" কুমার কহিলেন—"এই তরুর রস এখনই হলাহলের ন্যায় তিক্ত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে না জানি

ইহা কিরূপ হইবে! কত লোক না জানিয়া ইহার ফল মুখে দিয়া বিড়ম্বিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইবে।"

এই কথা বলিয়া রাজকুমার সেই অঙ্কুরটি ভূতল হইতে উৎপাটিত করিয়া করতলে মর্দ্দনপূর্ব্বক নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন—"রাজকুমার, এই নবোদ্গত নিম্বাঙ্কুর এখনই বিষোপম, পরিণামে না জানি ইহা কিরূপ ভয়ানক হইবে, এই ভাবিয়া তুমি যেমন ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেলিলে, সেইরূপ তোমার পিতার প্রজাগণও তোমার সম্বন্ধে মনে করিতেছে যে, তুমি শৈশবেই যেরূপ দুঃশীল হইয়া উঠিয়াছ, বড় হইয়া রাজ্যলাভ করিলে না জানি তুমি কিরূপ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিবে। তাহারা ভাবিতেছে যে, তোমার আশ্রয়ে বাস করা তাহাদের নানারূপ দুঃখ ও অশান্তির কারণ হইবে। সেই জন্য তাহারা তোমাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে, এমন কি, কেহ কেহ এখন তোমার প্রাণনাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব এখন হইতে দুঃশীলতা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষমা, দয়া ও মৈত্রী অভ্যাস করিতে যত্নবান্ হও।"

সন্ন্যাসিপ্রদত্ত দৃষ্টান্ত নিষ্ফল হইল না। দুর্ব্বৃত্ত রাজকুমার তদীয় উপদেশের সারবত্তা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন, স্বভাবের দোষগুলি অল্পবয়সে সংশোধিত না হইলে পরিণামে তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও আত্মপর সকলেরই অশেষদুর্গতির কারণ হইতে পারে। তদবধি "দুষ্টকুমার" অত্যন্ত সুশীল হইলেন এবং মনোযোগপূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন।

চন্দ্র।

ভুবনমোহন-রূপ-ধর তুমি শশি!
তোমার কৌমুদীরাশি তামসীর তম নাশি,
কেমনে সাজায় তারে মোহিনী রূপসী!
পরায় সোণার হার নদীর গলায়,
সৈকত * পুলিনে তার চুমকি বসায়!

নভো-নীল-হ্রদে তুমি হীরার কমল!
পুঞ্জ পুঞ্জ মধুব্রত মকরন্দপানে রত,
তাই কি নিয়ত কোলে কালিমা কেবল?
রবির তোমাতে দেখি বড়ই সোহাগ,—
নিজ করে সদা ক'রে দেয় অঙ্গরাগ। †

ললিতলাবণ্যে তব জুড়ায় নয়ন।
উদিলে গগনতলে, শিশুগণ কুতূহলে,
অনিমিষে তোমাপানে করে বিলোকন।
আদরে প্রসূতি ডাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে,
মণির কপালে তার চিক্ দিয়ে যেতে।

---

* বালুকাময়।

† সূর্য্যের কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া জ্যোৎস্নারূপে লোকের নয়ন গোচর হয়। চন্দ্র স্বয়ং উজ্জ্বল নহে।

সবাই তোমারে ভালবাসে শশধর !
নির্ম্মল চাঁদিনী রাতে বাঁশরী লইয়া হাতে
রাখাল বাজায় কিবা সুললিত স্বর !
নীরব নিশায় অই বাঁশরীর স্বরে
অমিয়ের ধারা ঢালে শ্রবণ-বিবরে।

বিভ্রম ঘটাতে তুমি বড়ই চতুর,
বিভাবরী দ্বিপ্রহরে, দিনমান মনে ক'রে,
আধ ঘুম-চোখে পিক কুহরে মধুর।
নীরে ক্ষীর ভাবি লুব্ধ মার্জ্জারের মন ;
বিটপে বিকট ভূত দেখে ভীরুজন।

বহুরূপী ইন্দু তুমি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলে,
কভু বক্ররেখাসম, কভু অর্দ্ধবৃত্তোপম,
কভু বা বর্ত্তুল দেহে উঠ নভস্তলে ;
কভু তব অদর্শনে অমা-নিশীথিনী
গলিত-চিকুর-ভারে কাঁদে অনাথিনী* ।

রঙ্গরসে সুরসিক চন্দ্র তুমি বট,
এই স্ফুট হাস হাসি তব সুধা-অভিলাষী
চকোর নিকটে চির-প্রণয় প্রকট,
আবার মেঘের আড়ে লুকায়ে মূরতি,
প্রকাশ কপটকোপ অনুগত প্রতি।

* এস্থলে অন্ধকারকে রজনীর কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

কলঙ্কী শশাঙ্ক তুমি জগতে প্রচার !
নিশাভাগে নিরজনে, কাহারো কোমল মনে
কভু কি বিষণ্ণ ভাব করহে সঞ্চার ?
তব হিমকরে বাড়ে দেহতাপ যার,
সে জানে পাষাণে গাঁথা হৃদয় তোমার। *

ও কলঙ্ক কলানিধি ! ধরি না তোমার,
সাগর মথিত হলে, উগারিল হলাহলে,
তবু রত্নাকর নাম প্রথিত তাহার।
যে জ্বলে জ্বলুক তবু কিরণ-গরলে।
সুধাকর নাম তবু ঘোষিবে সকলে।

* প্রিয়জনের বিয়োগজনিত শোকে যে ব্যক্তি কাতর, চন্দ্রদর্শনে তাহার শোক আরও বর্দ্ধিত হয়।

প্রকৃতির শোভা।

একদা নিদাঘকালে নিশীথ-সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর-সেবনে।
প্রকৃতির বিচিত্রতা করি দরশন,
ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধু-জলে মন।
উত্তালতরঙ্গময় সাগর-সমান,
কোলাহল-পূর্ণ ছিল যেই জনস্থান,
নির্ব্বাত-তড়াগ সম হয়েছে এখন,
স্তব্ধীভূত সুগম্ভীর শান্ত-দরশন।
তরুপরে ঝিল্লী শুধু ঝিঁ ঝিঁ রব করে,
সুধার সু-ধারা ঢালে শ্রবণবিবরে।
ভুবনব্যাপিনী চারু চন্দ্রিকার ভাস,
বোধ হয় প্রকৃতির আস্য-ভরা হাস।
মন্দ মন্দ সুশীতল সমীর সঞ্চরে,
যেন নড়ে তালবৃন্ত প্রকৃতির করে।
টুপ্ টাপ্ পড়িছে শিশির-বিন্দুচয়,
প্রকৃতির সুখ-অশ্রু অনুভূত হয়।

চেয়ে দেখি নিরমল সুনীল আকাশে,
সমুজ্জ্বল অগণন তারকা সঙ্কাশে ;
যেন নীল-চন্দ্রাতপ ঝক্ ঝক্ জ্বলে,
হীরকের কাজ তায় করা সুকৌশলে।
অনন্তর প্রমোদ-অন্তরে ধীরে ধীরে,
উপনীত হইলাম তটিনীর তীরে ;
বিকসিত কামিনী-কুসুমতরুতলে,
বসিলাম চিন্তাসখী সহ কুতূহলে।
মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল-নীরময়ী মৃদুলগামিনী,
মন্দ-মন্দ-বায়ু-ভরে মন্দ মন্দ হেলে ;
বিধুর উজ্জ্বল আভা তার হৃদে খেলে।
কল্লোলিনী কলস্বরে করে কুল কুল,
কি ছার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।
আম জাম নারিকেল গুবাক তেঁতুল,
নানাজাতি তরুদলে শোভে দুই কূল।
শশি-করে তাহাদের স্নেহময় কায়,
মরি কি আশ্চর্য্য শোভা ধরিয়াছে হায়।
কোথাও বাঁশের ঝাড় বাঁকিয়া পড়েছে,
কোথাও তেঁতুল-ডাল হেলিয়া রয়েছে।
শোভিছে তাদের ছায়া সলিল ভিতরে,
ক্ষণে স্থির, ক্ষণে দোলে সমীরণভরে।

থেকে থেকে গুপ্ গাপ্ করে মৎস্যগণ,
সে রবশ্রবণে হয় মোহিত শ্রবণ।
সারি সারি তরণী দু-ধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়।
কেহ বা জাগিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।
এইরূপে প্রকৃতির রূপদরশনে,
অহো! কি বিমল সুখ উপজিল মনে!
শিহরিল কলেবর পুলকে পূরিল,
আনন্দাশ্রু অপাঙ্গেতে উদিত হইল।
মনে মনে কহিলাম—অয়ি সুপ্রকৃতে!
শোভনে! বিচিত্র চারু-ভূষণ-ভূষিতে!
মরি মরি কিবা তব মোহিনী মূরতি,
নিরখি নয়নে হল জড়প্রায় মতি!
অপরূপ তব রূপ একরূপ নয়,
নব নব রূপ ধর সময় সময়।
যখন প্রাবৃট্‌কালে জলদের দল,
নিয়ত ঢাকিয়া থাকে গগনমণ্ডল;
ঝম ঝম রবে হর্ষে বর্ষে নব নীর,
মাঝে মাঝে ভীমরবে গরজে গভীর,
থেকে থেকে জ্যোতির্ম্ময়ী চপলা চমকে,
ভুবন উজ্জ্বল করে রূপের ঠমকে;

কদম্ব কেতকী আদি কুসুমনিকরে,
ফুটিয়া কানন-কায় অলঙ্কৃত করে ;
তখন তোমার চারুরূপ-দরশনে,
বল বল নাহি হয় মুগ্ধ কোন্ জনে ?
সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব-পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন ;
ফুল্ল ফুল দুর্ব্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্যবদনে ;
বিহঙ্গ-নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত,
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?
এইরূপ যে সময় যেই রূপ ধর,
তাতেই তখন ভব-জন-মন হর।
সাধে কি গো কত মহা-মহাকবিবর,
উপেক্ষিয়া নগরের শোভা মনোহর
গভীর অরণ্যে, ঘন শ্যামল প্রান্তরে,
ভীষণ বিজন গিরি-শিখর গহ্বরে ;
হেরিবারে তোমার এ রূপ বিমোহন,
অনুক্ষণ স্তব্ধভাবে করেন ভ্রমণ ?
সাধে কি গো সুকোমল শয্যা পরিহরি,
তটিনীর তীরে তাঁরা আগমন করি,
তরুতলে ধরাসনে কুতূহলে বসি,
তবরূপ-দরশনে কাটান তামসী ?

সাধে কি গো কবিদের সফল নয়ন,
তুচ্ছ ভাবে অট্টালিকা, স্তম্ভ সুশোভন,
সামান্য তরুর পাতা করি দরশন,
মুহুর্মুহুঃ পুলকাশ্রু করে বরষণ ?
ধিক্ সে মানবগণে ধিক ধিক্ ধিক্ !
তোমা চেয়ে শিল্পে যারা বাখানে অধিক ;
হেরিতে কৃত্রিম শোভা ব্যগ্রচিত্তে ধায়,
তোমার সৌন্দর্য্য পানে ফিরিয়া না চায় !
উদ্যান-বিপিন-গিরি করিয়া ভ্রমণ,
তোমার বিচিত্ররূপ হেরে না কখন,
বনবাসী বিহঙ্গের মধুময় গান,
শ্রবণ করিয়া কভু না জুড়ায় প্রাণ ;
বিফল তাদের জন্ম বিফল জীবন,
কখন না দেখে তারা সুখের বদন।
ধন্য ধন্য সেই সুচতুর শিল্পকর !
যে রচিল তোমার এ তনু মনোহর।
বিচিত্র কৌশল তাঁর অনন্ত শকতি,
বারেক ভাবিলে হয় অবসন্না মতি।
বল গো শোভনে অয়ি প্রকৃতি-সুন্দরি !
কে রচিল তোমার এ কান্তি সুখকরী ?
কোথা সেই রচয়িতা সর্ব্বগুণাধার ?
কোথা গেলে পাব আমি দরশন তাঁর।

সত্যের জয়।

জগতে যাঁহারা ধনিরূপে পরিচিত হইয়া লোকের হিতকার্য্যে সম্পদের সদ্‌ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কেহই অপরকে প্রতারিত করিয়া ধনসঞ্চয় করেন নাই। শঠতা বা অন্য অসদুপায়, অবলম্বনে যে অর্থ অর্জ্জিত হয়, তাহা কোনক্রমে স্থায়ী হয় না। পাপের ধন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিয়া আপনিই লয় প্রাপ্ত হয়। সাধুতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অধ্যবসায়, এবং পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সাহায্যে ধর্ম্মপথে চলিয়া লোকে যে বিত্ত সঞ্চয় করে, তাহাই স্থায়ী হইয়া জগতের কল্যাণসাধন করিতে থাকে। সত্যপথে চলিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকার দুই ব্যক্তি কি প্রকারে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন, নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ হইল।

(১)

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ভুবনবিখ্যাত কোটিপতি কার্ণেগীর নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যে সাধারণের হিতকার্য্যে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন। কার্ণেগী কিপ্রকার বিপুল সম্পদের অধিকারী, তাহা এই দানের কথা শুনিলে অনুমান করা যায়। কেবল সাধুতা,

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং দূরদর্শনই তাঁহার কর্ম্মনীতির মূলসূত্র ছিল। কিপ্রকারে তিনি সামান্য রেল-কর্ম্মচারীর পদ হইতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনীর আসন লাভ করিয়াছেন, তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়।

যখন কার্ণেগী রেলবিভাগে একশত টাকা বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তখন একদা কোন অপরিচিত ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কতকগুলি কাগজ দেখাইয়া বলিলেন "এই দেখুন কয়েকটি নূতন রেল-গাড়ীর চিত্র। যদি চিত্রানুযায়ী গাড়ী নির্ম্মাণ করা যায়, তাহা হইলে আরোহীদিগের নানাপ্রকারে সুবিধা হইবে। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।"

নূতন গাড়ীর পরিকল্পনা অতি উত্তম বলিয়া কার্ণেগীর মনে হইল। তিনি সেই চিত্রগুলি রেলের কর্ত্তৃপক্ষকে দেখাইলেন। তাঁহারা চিত্র দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তদনুযায়ী কয়েকখান গাড়ী নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। অসৎ লোক হইলে কার্ণেগী চিত্রগুলি নিজেরই পরিকল্পিত বলিয়া প্রচার করিতেন, এবং নিজ ব্যয়ে গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি অসাধু ছিলেন না; আনন্দে ছুটিয়া গিয়া সেই ভদ্রলোকটিকে গাড়ী নির্ম্মাণ করিতে বলিলেন।

ভদ্রলোকটি এই সুসংবাদে বিষণ্ণ হইয়া ক্ষণকাল নতমুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং পরে কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "আপনি যে সুসংবাদ আনিয়াছেন, তাহা হতভাগ্য আমার নিকটে দুঃখের কারণ হইয়া পড়িল। আমি কপর্দ্দকহীন; গাড়ী নির্ম্মাণের

ব্যয়ভার বহন করা আমার অসাধ্য। হায়, যদি কেহ আজ অর্থ দিয়া আমাকে সাহায্য করিত, তবে কি আনন্দই হইত।"

কার্ণেগী তখন বিশেষ ধনবান্ ছিলেন না; চাকুরীর সামান্য বেতনই তাঁহার অবলম্বন ছিল। তথাপি মিতব্যয়িতাবলে তিনি কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সেই অর্থ তিনি সানন্দে ভদ্র-লোকটিকে ঋণস্বরূপ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। লোকটি কৃতজ্ঞ হৃদয়ের আবেগ সংযত করিতে না পারিয়া সাশ্রুনয়নে কার্ণেগীকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

গাড়ী নির্ম্মিত হইল। সেগুলি গ্রহণ করিয়া রেল-কোম্পানি আরও নূতন গাড়ী নির্ম্মাণের আদেশ দিলেন। এখন আর অর্থাভাব হইল না। দুই বৎসরে গাড়ী বিক্রয় করিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ হইল। ইহা হইতে কুড়ি হাজার টাকা কার্ণেগীর নিজের অংশে আসিল। এই অর্থই তাঁহার মূলধন হইয়াছিল, এবং তাহাই নানাব্যবসায়ে প্রয়োগ করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

কার্ণেগী সত্যপথে চলিয়াছিলেন বলিয়াই আজ তিনি ধনি-শ্রেষ্ঠ হইয়া জগতের উপকার সাধনে সুযোগ পাইয়াছেন।

(২)

ইংলণ্ডের প্রধান ধনি-পরিবার রথচাইল্ডের নাম আজকাল কাহারও অজ্ঞাত নাই। পৃথিবীর সর্ব্বত্র রথ্‌চাইল্ডগণের ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতেছে। তাঁহারা এখন দশসহস্রকোটি মুদ্রার অধি-কারী। অর্থাভাব হইলে সর্ব্বদেশের প্রধান বণিগ্‌গণ তাঁহাদের

নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করেন। নানা দেশের নৃপতিগণও তাঁহাদের নিকট ঋণী। কথিত আছে, তাঁহাদের সঞ্চিত ধনের সুদে যে অর্থাগম হয়, কেবল তাহাতেই ফ্রান্সের ন্যায় একটি দেশের অধিবাসিগণের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে। এখন ভাবিয়া দেখ, রথচাইল্ডগণ কি অপরিমেয় ধনের অধিকারী।

যাহা হউক রথচাইল্ড পরিবারের এই বিপুল ধনলাভের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইহার এক কপর্দ্দকও অসদুপায়ে অর্জ্জিত হয় নাই। ধর্ম্মের ও সত্যের ভিত্তির উপরে সুপ্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া এই সুবর্ণরাশি আজিও অক্ষয় রহিয়াছে।

রথ্‌চাইলড্‌ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ মোজেস্‌ রথচাইল্ড্‌ ধনী ছিলেন না; সামান্য ব্যবসায়ে যৎসামান্য মূলধন ও শরীর খাটাইয়া তিনি গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করিতেন। এই সময়ে ফরাসী দেশে এক ঘোরতর রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটে। প্রজাগণ উত্তেজিত হইয়া রাজা, রাজবংশ ও অভিজাত পরিবার সমূহের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। ফরাসী সম্রাট্‌ ও তদীয় পত্নী বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক বন্দী হইয়া নিহত হন। এই বিপ্লব বহ্নির সর্ব্বগ্রাসিনী মূর্ত্তি দেখিয়া ইউরোপের ক্ষুদ্র নৃপতিগণ রাজ্যত্যাগ করিয়া নিরাপদ স্থানে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণীর হেসি নামক খণ্ডরাজ্যের রাজা দেশত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজকোষে যে রাশিকৃত অর্থ ছিল, তাহা কোথায় রাখিয়া যাইবেন স্থির করিতে না পারিয়া তিনি চিন্তিত

হইলেন। এই দুঃসময়ে মোজেসের কথা তাঁহার স্মরণ হইল; নিঃস্ব হইয়াও সাধুতা ও ধর্ম্ম পরায়ণতার জন্য তিনি অনেকের নিকটেই সুপরিচিত ছিলেন। রাজা তাঁহার সমগ্র ধনরাশি মোজেসের হস্তে সমর্পণ করিয়া রাজ্য ত্যাগ করিলেন।

এই প্রকারে পরের ধনের রক্ষক হইয়া মোজেস্ চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন। ইহার উপরে বিপ্লবকারিগণ যে প্রকারে দেশের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিতেছে, তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহার চিন্তার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অনন্যোপায় হইয়া মোজেস্ রাজার ধনরাশি গৃহ-প্রাঙ্গনে প্রোথিত রাখিলেন।

ইহার কয়েক দিন পরেই বিদ্রোহীর দল দ্বার ভাঙ্গিয়া মোজেসের গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাঁহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। কিন্তু ভূগর্ভে যে ধনরাশি লুক্কায়িত ছিল, দুর্ব্বৃত্তগণ তাহার সন্ধান পাইল না। নিজের সর্ব্বস্ব দস্যুহস্তে সমর্পণ করিয়াও পরধন রক্ষা করিতে পারিয়াছেন দেখিয়া মোজেস্ নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং নতজানু হইয়া জগদীশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ক্রমে ফরাসী বিপ্লবের অবসান হইল। রাজা স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু তিনি মোজেসের নিকট হইতে গচ্ছিত ধন পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করিলেন না। বিদ্রোহিগণ যে মোজে-সের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছে, এই সংবাদ তিনি পূর্ব্বেই পাইয়া-ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছিল, মোজেসের নিকটে তাঁহার গচ্ছিত অর্থের এক কপর্দ্দকও নাই। কিন্তু মোজেস্ শঠতা বা

প্রতারণা কাহাকে বলে জানিতেন না ; সমস্ত গচ্ছিত ধনরত্ন সঙ্গে লইয়া তিনি একদিন রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নিজের সকল সম্পত্তি দস্যুর করে সমর্পণ করিয়া মোজেস্ কি প্রকারে গচ্ছিত ধন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া রাজা বিস্মিত হইলেন। তিনি মোজেসের অপূর্ব্ব সাধুতা ও স্বার্থ-ত্যাগে মুগ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন,—"আমি এই গচ্ছিত ধনরাশি স্পর্শ করিব না। তুমি ইহাই মূলধনরূপে গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হও। যদি ব্যবসায়ে লাভ হয়, তাহা হইলে লাভের অর্থ হইতে আমার প্রাপ্য পরিশোধ করিও ; ক্ষতি হইলে গচ্ছিত অর্থ আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না।"

এইপ্রকারে মোজেস্ রথ্‌চাইল্ডের বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাঁহার সাধুতার খ্যাতি নানাদেশে প্রচারিত হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যে তিনি এমন লাভবান্ হইয়াছিলেন যে, রাজার গচ্ছিত অর্থ পরিশোধ করিয়াও তিনি দেশের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সত্যে এবং পুণ্যে বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল বলিয়াই মোজেস্ রথচাইল্ডের বংশধরগণ আজও এত সমৃদ্ধিশালী।

ভারতে ক্রীতদাস প্রথা।

আমরা যখন গো, মেষ এবং অশ্বাদি পশু ক্রয় করি, তখন তাহাদের উপরে আমাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিবার অধিকার হয়। আমার ঘোটকটিকে যদি আমি দুই দিন অনাহারে রাখি, বা অধিক পরিশ্রম করাই, কিংবা অপর কাহারও নিকটে বিক্রয় করি, তাহা হইলে এই সকল নিষ্ঠুর কার্য্য সহসা অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হয় না। দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশে এই প্রকারেই মানুষ ক্রয়-বিক্রয় চলিত; এবং এই উপলক্ষে মানুষের প্রতি মানুষ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। কতকগুলি নির্ম্মম ব্যক্তি এক দেশ হইতে মানুষ হরণ করিয়া অপর দেশে বিক্রয় করিত। এই প্রকারে ক্রীত মানুষকে "ক্রীতদাস" বলা হইত।

মানুষ চুরী করিবার সময়ে দরিদ্র পরিবারের উপরে যে সকল লোমহর্ষণ অত্যাচার হইত তাহা অবর্ণনীয়। গভীর রাত্রিতে যখন সকলে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তখন দাসব্যবসায়িগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া দস্যুর ন্যায় সদলবলে অতর্কিতভাবে গৃহস্থদিগকে আক্রমণ করিত। তাহারা মাতৃক্রোড় হইতে বালক পুত্রকে এবং বৃদ্ধ মাতাপিতার পার্শ্ব হইতে যুবক তনয়কে হরণ করিয়া লইত। ইহাদের পাপকবল হইতে স্ত্রীলোকদিগেরও মুক্তি ছিল না। শিশুপুত্রকে মাতৃবক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া

পাষণ্ডেরা নদীর অতলজলে বা শৃগাল কুক্কুরের মুখে নিক্ষেপ করিত। অপহৃত নরনারীদিগের মধ্যে কেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, সেই নরপিশাচগণ তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত না, পীড়া কঠিন হইয়া পড়িলে হতভাগ্য ক্রীতদাসগুলিকে সমুদ্রজলে ফেলিয়া দিত বা নির্জ্জনবনে ত্যাগ করিয়া যাইত।

যে ইংরাজ আজ ধনে, বলে, জ্ঞানে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বে সমগ্র সভ্যজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রথমে এই পাপপ্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ক্রীতদাসপ্রথা রাজবিধানে ইংলণ্ডে সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হইয়াছিল। পরে ইংরাজদিগেরই উৎসাহে ও আয়োজনে ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, প্রুশিয়া ও রুসিয়া হইতে তাহা দূরীভূত হইয়াছিল। বিদেশীয় রাজাদিগের অধিকারে যে সকল ক্রীতদাস কৃষিকার্য্যাদি করিতেছিল, তাহাদিগকে মুক্তি দিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজকোষ হইতে প্রায় দেড়শত কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। উৎপীড়িত মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য ঈদৃশ স্বার্থত্যাগের উদাহরণ আর দেখা যায় না।

যাহা হউক, যখন ইউরোপ হইতে ক্রীতদাসপ্রথার উচ্ছেদ হয়, তখন ভারতবর্ষে ইংরাজরাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং তখন ইংরেজগণের পক্ষে রাজবিধানদ্বারা ঐ নিষ্ঠুর প্রথার উচ্ছেদসাধন অসম্ভব ছিল। সেই সময়ে মান্দ্রাজ অঞ্চলে দশ টাকায় এক একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষ ক্রয় করা যাইত, এবং এক বৎসরের বয়সের শিশুর মূল্য তিন টাকার অধিক ছিল না।

গো-মহিষাদি পশু কিপ্রকারে হাটে বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা সকলেই জানে। কলিকাতা, ঢাকা, পাটনা, দিল্লী-প্রভৃতি জনবহুল নগরে গো-মহিষাদির ন্যায় প্রকাশ্যভাবে মনুষ্যবিক্রয় হইত। গৃহপালিত কুক্কুর হারাইয়া গেলে, আমরা যেমন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া তাহার অনুসন্ধান করি, সেকালে কোনও ক্রীত-দাস পলায়ন করিলে সেই প্রকারে বিজ্ঞাপনে পুরস্কার ঘোষণা করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করা হইত। সংসারের সর্ব্বপ্রকার জঘন্য ও নিষ্ঠুর কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য লোকে ক্রীতদাস-দিগেরই সাহায্যগ্রহণ করিত। আদেশ অনুসারে কার্য্য না করিলে ক্রীতদাসদিগকে হত্যা করারও প্রথা ছিল।

মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করিলে, ক্রীতদাসদিগের দুঃখের কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এই হতভাগ্যদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া দুঃখমোচন করে, এরূপ কোন ব্যক্তি তখন ভারতবর্ষে ছিল না। ইহাদের দুঃখে কেবল লর্ড কর্ণওয়ালিসের করুণ হৃদয় বিগলিত হইল; তিনি ভারতভূমি হইতে দাস-ব্যবসায় নির্মূল করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন। নিষ্ঠুর দাসব্যব-সায়িগণ এই পুণ্যকার্য্যে অনেক বাধাপ্রদান করিতে লাগিল; কিন্তু কর্ণওয়ালিস্ সকল বাধা ও প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য ক্রয়বিক্রয়কার্য্য দস্যুবৃত্তি এবং নরহত্যার তুল্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যাহারা এই ঘোষণার পরেও দাস-ব্যবসায় ত্যাগ করিল না, সুপ্রিম কোর্টের বিচারে তাহাদিগকে কারাবাস,

নির্ব্বাসনপ্রভৃতি কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইল। এই প্রকারে কয়েক বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ হইয়াছিল। ভারতসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জ এবং বঙ্গদেশের সুন্দরবন প্রভৃতি স্থান দাস-ব্যবসায়ীদিগের অত্যাচারে প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিসের করুণায় সেই সকল স্থান অল্প-দিনের মধ্যে আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া দাঁড়াইল। ক্রীতদাস প্রথা রহিত করিয়া মহাত্মা কর্ণওয়ালিস্ ভারতের যে মহদুপকার সাধন করিয়াছেন, সমগ্র ভারতবাসী তাহার জন্য চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

সালেহ্ রাজার কথা।

(সাদির বুস্তা হইতে)

তুরস্কদেশে প্রতাপান্বিত সালে নামে নরপতি,
হর্ম্ম্যশোভন রাজধানী তাঁর নয়নাভিরাম অতি।
রাজে উজ্জ্বল রতনখচিত পাষাণ-প্রাসাদ তাঁর,
ঝালরে ঝলিত ছাদেরে ঘেরিয়া দাঁড়ায় স্তম্ভসার।
গোলাপজলের উৎস প্রাসাদ-কানন-কুঞ্জে মাতে,
বহয়ে তাহার সুরভি সমীর জানালাতে জানালাতে।

এত সম্পদ মাঝেও রাজার চিতে নাহি কোন সুখ,
সকালে ও সাঁঝে রাজপথ-মাঝে বোর্কায় ঢাকি মুখ—
কভু বিপণিতে কভু পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়ান একা,
কি গ্রীষ্ম শীত, সকলি সমান—চরণ ধূলিতে মাখা।
গায়ের উপরে ঠেলিয়া পথিক পাশ দিয়া চলি যায়,
সবার সঙ্গে রাজা যান ঠেলি—ভ্রূক্ষেপ নাহি তায়!

একদা প্রভাতে মস্‌জিদে গিয়া হেরেন হঠাৎ ভূপ,
দুজন ফকির শীতে জড়সড় ক্লিস্ট কাতর-রূপ ;
নগ্ন চরণ, ছিন্ন বসন, হিহি করি কাঁপে শীতে,
চেয়ে আছে কবে উদিবে সূর্য্য উৎকন্ঠিত চিতে।

তখনো রাতির নিকষে পড়েনি ঊষার সোণার রেখা,
নগরসৌধ-স্বুবর্ণচূড়া তখনো দেয় নি দেখা!
দু'জনে মিলিয়া করিছে আলাপ, রাজার কাণে তা গেল—
"এতদিন ধরি সহিলাম ক্লেশ, কি ফল তাহাতে বল ?
স্বুখে আছে রাজা বাদ্‌শারা, তারা স্বর্গে ইহার পরে
করিবে দিব্য আনন্দভোগ! তবে এ ধর্ম্ম তরে
এত দুঃখের কোন্ প্রয়োজন ? স্বর্গ রাজাও পাবে,—
এমনি স্বুলভ যদি রে স্বর্গ কে তবে সেথায় যাবে ?"

"আমি ত কবর হ'তে তাহা হ'লে তুলিব না মাথা ভাই,
কিবা আসে যায় এমন স্বর্গ পাই কিবা নাহি পাই ?
সত্যই বলি স্বর্গকাননে সালেহেরে যদি হেরি!
পাদুকায় তার আরাম-কোমল মাথা দিব গুঁড়া করি!
এখনি কেমন কুস্থম-পেলব শয়নে সে রাতি যাপে,
শীতের তীব্র তীক্ষ্ণ বাতাসে আমাদেরই প্রাণ কাঁপে!"

শুনিয়া সালেহ ফকির-বচন প্রাসাদে গেলেন ফিরি,
মনে হ'লো তার মিথ্যা ও ফাঁকি দুনিয়া-বাদসাগিরি!
তখনি বারেক হইল বাসনা সন্ন্যাসিদ্বয়ে ডাকি,
তা'দের বসায়ে রাজার আসনে বুঝান কি যে এ ফাঁকি;—
স্থখ-সমৃদ্ধি কত যে শূন্য, বিলাসে কি হাহাকার,
কি দুর্ভাগা যে নরপতি তার অন্তরে কি যে ভার।

দূত গিয়া ত্বরা ফকির দুজনে সভায় ডাকিয়া আনে—
নূতন আসনে বসান তাদেরে নৃপতি সসম্মানে।
সুগন্ধময় সুপরিচ্ছদ পরিয়া রাজার পাশে
বসিয়া তাঁহারা স্মরি নিজ কথা মরেন বিষম ত্রাসে।
যোড়কর করি কহেন, "রাজন্, অভাজন মোরা অতি ;
মান্যের ছলে পরিহাস কভু সাজে কি মোদের প্রতি ?"
রাজা হাসি কন্, "প্রভু, পরিহাস আমারেই আমি করি,
দৈন্য যে আছে লুকাবার লাগি রাজার এ বেশ পরি!
স্বর্গ দুঃখীর জানি ব'লে আমি ঘুরি রাজবেশ ছাড়ি ;
তোমাদেরি মাঝে স্বর্গ যে মোর, সে স্বর্গ লবে কাড়ি ?"

শুনি, লজ্জায় সন্ন্যাসীদের মুখে নাহি বাণী সরে—
সুখে যে বিরাগী সেই দরবেশ বুঝিল ইহার পরে।

ইতরপ্রাণীর বন্ধুতা।

মনুষ্যজাতি নিসর্গ হইতে যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছে, ইতরপ্রাণিমণ্ডলী তাহার অধিকাংশ হইতে বঞ্চিত। ভক্তি, সংযম, কৃতজ্ঞতা, নিয়মানুবর্ত্তিতা প্রভৃতি সদ্বৃত্তিসমূহ এবং বাক্-শক্তি ও সর্ব্ববিধ অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করিবার শক্তি মানবজাতির নিজস্ব। বস্তুতঃ এই সকল বৃত্তি ও শক্তিই মনুষ্যকে ইতরপ্রাণিমণ্ডলী হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এতদ্ভিন্ন মানুষে সন্তানস্নেহ, বন্ধুতা, সহযোগিতা প্রভৃতি যে সকল ধর্ম্ম লক্ষিত হয়, ইতরপ্রাণিগণও অল্পাধিক পরিমাণে তৎসমুদয়ের অধিকারী। এই পাঠে বিভিন্নজাতীয় প্রাণিগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বন্ধুতা-সম্বন্ধে কয়েকটি অদ্ভুত উদাহরণ প্রদত্ত হইতেছে।

হস্তিযূথ যখন দলবদ্ধ হইয়া শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্ম-ত্রাণের চেষ্টা করে এবং পিপীলিকাসমূহ বা মধুমক্ষিকাগণ যখন একত্র অবস্থানপূর্ব্বক আপনাদের আবাসস্থানের উন্নতির জন্য প্রাণপণে যত্ন করে, তখন তাহা দেখিয়া কেহ বিস্ময় প্রকাশ করে না। কেননা দলবদ্ধ হইয়া বাস করাই ইহাদের স্বভাব; দলের কল্যাণ ব্যতীত ইহাদের একের কল্যাণ অসম্ভব।

কিন্তু যখন কোন গাভী মাতৃহীন মেষশাবকের দুঃখ দেখিয়া স্বীয় স্তন্যধারায় তাহাকে পোষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন

অনুমান করিতে হয় যে, নিজের বা নিজ-জাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির চেষ্টা ব্যতীত তাহার আরও দুই একটি সৎপ্রবৃত্তি আছে।

পালনকর্ত্তার সহিত কুক্কুরের যে পরম বন্ধুতা হয়, তাহা আমরা আশৈশব প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছি; কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণীর সহিত ইহাদের বন্ধুতার কথা কদাচিৎ কর্ণগোচর হয়।

লরেঞ্জো-নামক একজন আমেরিকাবাসী অধ্যাপক, কুক্কুর, মার্জ্জার ও শশক-প্রভৃতি চতুষ্পদ প্রাণী এবং পারাবত, কাকাতুয়া, শুক ও কুক্কুট-প্রভৃতি পক্ষী পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পশুপক্ষীদিগের মনের ভাব পরীক্ষা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অধ্যাপক লরেঞ্জো প্রথমে যখন তাহাদিগকে একত্র রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তখন তাহারা অত্যন্ত অনিচ্ছার ভাব প্রকাশ করিত, এবং বিরক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত বিবাদও করিত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে তাহারা হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের সহিত এমন বন্ধুতায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল যে, তখন কেহ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিত না। কুক্কুর ও পক্ষিজাতির মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধ চিরপ্রসিদ্ধ, কিন্তু উক্ত অধ্যাপকের কুক্কুট ও কুক্কুরের মধ্যে এমন বন্ধুতা জন্মিয়াছিল যে, যখন কুক্কুট কুক্কুরের কোমল ও দীর্ঘরোমরাশিতে আবৃত পৃষ্ঠে আসিয়া বসিত, তখন কুক্কুর অণুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিত না। ঐরূপে বিড়ালগুলি যখন স্বীয় শাবকগণকে নিকটে রাখিয়া মুদ্রিতনয়নে বিশ্রামলাভ করিত, তখন কুক্কুট বিশ্রামার্থ তাহাদের পৃষ্ঠে আসিয়া বসিলে বা ক্রোড়ে শয়ন করিলে,

তাহারা একটুও বিরক্ত হইত না, বরং নানা ভাবভঙ্গী দ্বারা আনন্দের ভাবই প্রকাশ করিত।

কিছুদিন পূর্ব্বে বিবি হামণ্ড্ নাম্নী এক ইংরাজ-মহিলা কুক্কুর ও শশকের অদ্ভুত বন্ধুতার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রচার করিয়াছিলেন। ঘটনাটি স্পেনের জেন্ নামক এক ক্ষুদ্র নগরে সংঘটিত হইয়াছিল। বিবি হামণ্ড্ স্পেনভ্রমণকালে কতিপয় ইংরাজ-পরিবারের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কোন পরিবারের বালকবালিকাগণ কুক্কুর বিড়াল প্রভৃতি পালন করিত। একদিন প্রভাতে সেই গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিবি হামণ্ড্ বালকবালিকাদিগের আনন্দকোলাহল শ্রবণ করিয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন যে, কয়েকটি শশকশাবক লাভ করিয়া বালকবালিকাগণ আনন্দধ্বনি করিতেছে। শাবকগুলি তখন নিতান্ত শিশু, স্বচেষ্টায় দুগ্ধপান করিবার শক্তিটুকু-পর্য্যন্ত উহাদের ছিল না। বালকবালিকাগণ দুগ্ধসিক্ত বস্ত্রখণ্ড শাবকগুলির মুখে ধরিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিল, কিন্তু রাত্রিকালে উহাদিগকে কোথায় আশ্রয় দেওয়া হইবে, ইহাই সকলের ভাবনার বিষয় হইল। শেষে স্থির হইল, গৃহে যে পালিত মার্জ্জারটি পাকশালার কোণে নিদ্রা যায়, শাবকগুলিকে তাহার নিকটে রাখা হইবে। গৃহস্বামী ও তাঁহার পত্নী এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন বটে, কিন্তু যাহাতে মার্জ্জারটি শশক-শাবকদিগের কোন অনিষ্ট না করিতে পারে, তজ্জন্য সতর্ক রহিলেন। শাবকগুলিকে মার্জ্জারের উষ্ণ ক্রোড়ে রাখা হইল,

মার্জ্জার একটুও বিরক্তিপ্রকাশ করিল না, বরং তাহাদিগকে পাইয়া পরমানন্দে তাহাদের গাত্রলেহন করিয়া স্নেহপ্রকাশ করিতে লাগিল। এই সময় হইতে শশকগণ বিড়ালের সহিত সর্ব্বদা একত্র অবস্থান করিত, ও একই পাত্রে আহার করিত। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শশকগণ যখন বিড়ালকে নানাপ্রকারে বিরক্ত করিত, তখনও তাহার ধৈর্য্যচ্যুতির কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইত না।

অষ্ট্রেলিয়াবাসী এক ভদ্রলোক কিছুদিন পূর্ব্বে বিড়াল ও হংসের অদ্ভুত বন্ধুতার একটি আশ্চর্য্য ঘটনা স্বগৃহে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। হংসের অপত্যস্নেহ প্রবল নয়। শাবক ডিম্ব হইতে নির্গত হইলে, হংসী তাহার আর সন্ধান লয় না। এ অবস্থায় গৃহস্থই শাবকগুলিকে আহারাদি দিয়া পালন করে। পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকের গৃহে কয়েকটি হংসশাবক জন্মগ্রহণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে একটি বাক্সে আবদ্ধ রাখিতেন এবং স্বহস্তে আহার দিতেন। গৃহের পালিত বিড়াল নীরবে গৃহস্বামীর এই কার্য্য দেখিত। ইহার পরে একদিন প্রত্যুষে মার্জ্জারকে হংসশাবকদিগের বাক্সে শয়িত দেখিয়া, গৃহস্বামী বিস্মিত হইয়াছিলেন; তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, হংসশাবকগুলি উদরস্থ করিয়া দুরন্ত বিড়াল নিদ্রা যাইতেছে, কিন্তু তিনি শেষে দেখিতে পাইলেন, সে শাবকগুলির একটুও অনিষ্ট করে নাই। তাহারা অক্ষতদেহে বিড়ালের ক্রোড় আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই সময় হইতে বিড়াল হংসশাবকগুলিকে

সন্তানবৎ দেখিত ; অনবধানতাবশতঃ কোন দিন সেগুলি বাক্স হইতে ভূতলে পড়িয়া গেলে, সে তাহাদিগকে সাবধানে মুখে করিয়া বাক্সে উঠাইয়া রাখিত।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অন্তঃপাতী নেব্রাস্‌কা-নামক স্থানের এক গো-পালক ইতরপ্রাণীর বন্ধুতাসম্বন্ধে যে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা আরও অদ্ভুত। বহু গাভীর মধ্যে একটি দুগ্ধবতী গাভীর দুগ্ধের পরিমাণ কয়েক দিন অকারণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত গো-পালক অনুসন্ধানে জানিয়াছিলেন যে, গাভীটি তাঁহারই এক শূকরশাবককে স্তন্যদান করে।

মাতৃহীন মেষশাবককে স্তন্যদানে পালন করার জন্য আমেরিকার কলোরেডো অঞ্চলের এক গর্দ্দভও এইপ্রকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কাষ্ঠভার বহন করিয়া আনয়ন করা এই গর্দ্দভের কার্য্য ছিল। ভারবহন করিয়া দিনান্তে প্রভুর গৃহে উপস্থিত হইয়াই সে তাহার প্রিয় মেষশাবকের অনুসন্ধান করিত, এবং মেষশাবক স্তন্যপান করিয়া তৃপ্ত হইলে, অবশিষ্ট দুগ্ধ তাহার নিজ শাবককে দান করিত।

চেল্‌সি হইতে উইলিয়ম-নামক এক ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার গৃহপালিত একটি কুক্কুর ও কপোতের মধ্যে যে বন্ধুতার পরিচয় পাইয়াছিলেন, তাহাও অল্প বিস্ময়কর নহে। কপোত ও কুক্কুর পৃথক্ স্থানে রক্ষিত হইত ; কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাদের মধ্যে এমন বন্ধুতা হইয়া পড়িয়াছিল যে, কপোতকে পিঞ্জরমুক্ত করিলেই সে কুক্কুরের সন্ধানে চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইত এবং

গাভী শূকর শাবককে স্তন্যদান করিতেছে।

কুকুর ও কুক্কুট।

কুক্কুরও কপোতের আগমন অপেক্ষা করিয়া উপবিষ্ট থাকিত। তৎপরে পরস্পারের সাক্ষাৎকার হইলেই কুক্কুর কপোতকে পৃষ্ঠে লইয়া আনন্দে ছুটিয়া বেড়াইত। কপোত ইহাতে যেন পরম আনন্দ উপভোগ করিত।

প্রভুভক্ত ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া ঘোটকের চিরকাল প্রসিদ্ধি আছে। ঘোর সঙ্কটে কেবল সুশিক্ষিত অশ্বের চাতুর্য্যে শত শত ব্যক্তি বিপন্মুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অশ্ব যে দুর্ব্বলতর অপর কোন প্রাণীর সহিত বন্ধুতাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে, এ কথা বোধ হয় এপর্য্যন্ত কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। আমেরিকার ব্রুক্‌মিউ-নামক প্রদেশের একটি অশ্ব বস্তুতই এই প্রকার বন্ধুতার পরিচয় দিয়াছে। এক বিড়ালের সহিত তাহার এপ্রকার বন্ধুতা হইয়াছিল যে, উভয়ে সর্ব্বদা একস্থানে থাকিতে ভালবাসিত। অশ্বশালাই বিড়ালটির বিচরণ-ক্ষেত্র ও বিশ্রামস্থান হইয়াছিল। মার্জ্জার ও অশ্ব উভয়েই অশ্বশালার তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিত এবং নিদ্রাকালে যাহাতে মার্জ্জার কোন প্রকারে আহত না হয়, তজ্জন্য ঘোটক সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত। অশ্ব ও মার্জ্জারের এই অদৃষ্টপূর্ব্ব বন্ধুতার পরিচয় পাইয়া গৃহস্বামী উভয়কেই সর্ব্বদা একত্র থাকিতে দিতেন। শেষে এই প্রাণিদ্বয় সাধারণের দর্শনীয় হইয়াছিল।

বৃথা বস্তু।

বৃথা সে সুদূরারোহ মহীরুহ-ফল,
বঞ্চিত যাহার স্বাদে মনুজ সকল।
বৃথা সে অমৃত-ভাষ-ভাষিণী রসনা,
না হয় যাহাতে সত্য-মহিমা ঘোষণা।
বৃথা সে কৃপণ-করতল-স্থিত ধন,
জগতের হিত যায় না হয় কখন।
অর্জ্জিত বিদ্যায় বল কিবা ফল তার,
বিদ্যা-অনুরূপ নহে ব্যবহার যার।
বল বল সে বলীকে বলী কেবা কয়—
কার্য্যকালে যার বল কার্য্যকারী নয়?
বিবেক-বিজ্ঞানে বল কিবা ফল তার,
সৎ-ক্রিয়া-সাহস নাই মনেতে যাহার?
বল তার জীবনেতে কিবা প্রয়োজন,
জীবন-সাফল্যলাভে বিমুখ যে জন?

উদ্ভিদের খাদ্য।

মনুষ্য গো মহিষ প্রভৃতি প্রাণিগণ যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহাদের খাদ্যের অভাব হয় না। ঈশ্বরের কল্যাণময় বিধানে সদ্যোজাত প্রাণীর জন্য প্রচুরখাদ্য মাতৃস্তনে সঞ্চিত থাকে, তাহারা উহাই পান করিয়া কিছুদিন জীবনধারণ করে। সদ্যো-জাত প্রাণীর সহিত এই বিষয়ে সদ্যোজাত উদ্ভিদের বিশেষ ঐক্য দেখা যায়। যখন বীজ হইতে অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষ ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন করে, তখন তাহাদিগকে আহার্য্য সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না। বীজে যে পুষ্টিকর সামগ্রী সঞ্চিত থাকে, তাহাই আহার করিয়া উহারা জীবন রক্ষা করে। সর্ষপ, তিসি, বাদাম, ধান্য, গোধূম এবং যব ইত্যাদি শস্যে যে সারবান্ সামগ্রী থাকে, তাহা শিশু উদ্ভিদ্দিগের জন্যই সঞ্চিত হয়।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে প্রাণীগণ কেবল স্তন্যপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না; তখন তাহারা অপর পুষ্টিকর খাদ্য সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের জীবনেও অবিকল তাহাই দেখা যায়। বীজে যে পুষ্টিকর খাদ্য থাকে, তাহা আহার করিয়া উদ্ভিদ্গণ অল্পদিনমাত্র জীবিত থাকিতে পারে। ইহা নিঃশেষ হইয়া গেলে, উদ্ভিদ্গণ ধীরে ধীরে মূলের মৃত্তিকা হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। মৃত্তিকায় মিশ্রিত কোন্ কোন্

সামগ্রী উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকর, আমরা এই পাঠে তাহারই আলোচনা করিব।

স্থূলতঃ বলিতে গেলে, জলজান, যবক্ষারজান, অঙ্গার, এবং ফস্‌ফরাস্, এই কয়েকটি মূল পদার্থই উদ্ভিদ্-দেহের প্রধান উপাদান। অম্লজান এবং জলজান এই দুইটি বায়বীয় পদার্থের যোগে জলের উৎপত্তি হয়। কাজেই জল হইতে উদ্ভিদ্‌গণ জলজান ও অম্লজান সংগ্রহ করিতে পারে। যে বায়ুরাশি সমগ্র পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহাতে প্রচুর যবক্ষারজান ও অম্লজান বিদ্যমান রহিয়াছে, এবং তাহাতে কিছু অঙ্গারক-বাষ্পও মিশ্রিত আছে। উদ্ভিদ্-গণ বায়ু হইতে অঙ্গার ও অম্লজান সংগ্রহ করিতে পারে।

প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীরগঠনের জন্য যবক্ষারজানের একান্ত প্রয়োজন। দেহে যবক্ষারজান যোগাইবার জন্যই আমরা ডাল মৎস্য, মাংস ইত্যাদি আহার করি। বায়ুরাশিতে প্রচুর যবক্ষারজান বিদ্যমান আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌গণের মধ্যে কেহই বায়ু হইতে বিশুদ্ধ যবক্ষারজান টানিয়া লইয়া দেহপোষণ করিতে পারে না। ইহা অপর পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া খাদ্যরূপ ধারণ করিলে, শরীরপোষণের উপযোগী হয়। মৎস্য, মাংস, ডাল প্রভৃতির যবক্ষারজান অপর পদার্থের সহিত মিশ্রিত আছে। এই কারণেই উক্ত খাদ্য দ্রব্যগুলি শরীরপোষণের উপযুক্ত হইয়াছে। এক শত ভাগ বায়ুতে প্রায় ৭৮ ভাগ অবিমিশ্র যবক্ষারজান আছে এবং অবশিষ্ট ২২

ভাগে অম্লজান, অঙ্গারক বাষ্প, জলীয় বাষ্প ইত্যাদি দেখা যায়। বিশুদ্ধ যবক্ষারজান যদি দেহগঠনে উপযোগী হইত, তাহা হইলে আমরা বায়ুভক্ষণ করিয়াই পুষ্ট হইতাম।

প্রাণিসম্বন্ধে যে কথা বলা হইল, উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে তাহাই বলা যাইতে পারে। উদ্ভিদ্গণ নিজে নিজে বায়ু হইতে যবক্ষারজান টানিয়া শরীরপোষণ করিতে পারে না। উর্ব্বরক্ষেত্রে নানা পদার্থের সহিত যে যবক্ষারজান মিশ্রিত থাকে, ইহারা তাহাই মূলের সাহায্যে দেহস্থ করিয়া পুষ্ট হয়।

জীবাণুর নাম তোমরা সম্ভবতঃ শুনিয়াছ। এইগুলি উদ্ভিজ্জাতীয় একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র জীব। ইহাদের আকার এত ক্ষুদ্র যে, এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে লক্ষাধিক জীবাণু স্থান পাইতে পারে। উৎকৃষ্ট অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত ইহারা চক্ষুগোচর হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, পৃথিবীর জল, স্থল, আকাশ, এই শ্রেণীর জীবে পরিপূর্ণ আছে। গুড়, মধু, ইক্ষু ও খর্জ্জুরাদির রসে যে গাজ জন্মে, একজাতীয় জীবাণুই তাহার কারণ। মৃতদেহ পচিয়া যাওয়া, দুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হওয়া ইত্যাদিও জীবাণুর কার্য্য। অত্যন্ত শীতল বা অত্যন্ত উষ্ণ স্থানে জীবাণু থাকিতে পারে না। এইজন্য মেরু প্রদেশের তুষার ক্ষেত্রে বা বালুকাময় মরুভূমিতে মৃতদেহ সহজে গলিত হয় না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে সকল জলচর প্রাণী মেরুপ্রদেশে মৃত হইয়াছে, এখন তুষারের অভ্যন্তরে তাহাদিগের মৃতদেহ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতেছে। জীবাণুরা যাহাতে মৃত মৎস্যাদির দেহে আশ্রয়

গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারই জন্য মৎস্য, মাংস, ফল-প্রভৃতি আজকাল বরফে আচ্ছন্ন রাখা হইতেছে। এই অবস্থায় ঐ সকল দ্রব্য বহুকাল অবিকৃত অবস্থায় থাকিতেছে।

কেবল এইগুলিই জীবাণুর কার্য্য নয়। পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, জীবশরীরের নানাপ্রকার ব্যাধি বিশেষ বিশেষ জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ব্যাধির জীবাণু আমাদের চারিদিকের বায়ু রাশিতে সর্ব্বদাই ভাসিয়া বেড়াইতেছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম অগ্রাহ্য করিলে বা শরীর দুর্ব্বল হইলে, ইহারা জীবদেহে আশ্রয়গ্রহণ করে এবং তথায় নানা বিষ-ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যাধি সৃষ্টি করিতে থাকে। বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা ইত্যাদি অনেক ভয়ানক ব্যাধি জীবাণু দ্বারা উৎপাদিত হয়।

যাহা হউক, একপ্রকার জীবাণু বায়ুরাশি হইতে অম্লজান টানিয়া উদ্ভিদের যে উপকার করে, তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। মটর, মসূর, কলাই, মুগ, বরবটি, এবং ধন্‌চে প্রভৃতি যে সকল উদ্ভিদের সুটিযুক্ত ফল হয়, তাহাদের মধ্যে কোন একটি গাছের মূল উৎপাটন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিও। ইহাতে দেখিতে পাইবে মূলের গাত্রে সর্ষপের বা ক্ষুদ্র মটরের আকারের বহু পিণ্ড সংলগ্ন রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঐগুলি এক জাতীয় জীবাণুর আবাসস্থান। ইহারা বৃক্ষমূলে বাসা বাঁধিয়া বায়ু হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করে এবং তাহাই খাদ্যের আকারে পরিণত করিয়া বৃক্ষদিগকে পরিপুষ্ট করে। ধন্‌চে বৃক্ষের মূলে

এই জীবাণুদিগের অনেক বাসস্থান দেখা যায়। এইজন্যই আমাদের দেশের কৃষকগণ উর্ব্বরতাবৃদ্ধির জন্য ক্ষেত্রে ধন্‌চে উৎপন্ন করেন, এবং পরে লাঙ্গল দিয়া তাহার মূল মৃত্তিকায় মিশাইয়া দেন। ইহাতে মৃত্তিকায় অনেক যবক্ষারজান গ্রহণ-ক্ষম জীবাণু সঞ্চিত হইয়া ক্ষেত্রের যবক্ষারজানের অভাব দূর করে।

গলিত বৃক্ষপত্র এবং গবাদি পশুর মলমূত্রে উদ্ভিদের অনেক খাদ্য আছে। এই কারণে ঐ সকল বস্তু ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। এইস্থলেও আর একপ্রকার জীবাণু উদ্ভিদ্‌গণের সহায় হয়। দুগ্ধ হইতে দধি প্রস্তুত করিতে গেলে তাহাতে সাঁজা দিতে হয়। সাঁজায় দধির জীবাণু থাকে; তাহাই দুগ্ধ বিকৃত করিয়া দধির উৎপত্তি করে। গবাদির মলমূত্র এবং গলিত লতাপাতা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলেই তাহার সারাংশ উদ্ভিদ্‌গণ গ্রহণ করিতে পারে না। কয়েক জাতীয় জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যখন ঐ সকল বস্তুকে বিকৃত করে, তখনই তাহা উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত হয়। এই জীবাণু ভূতলের উপরিভাগে অবস্থান করে। অর্দ্ধহস্ত নিম্নে ইহাদের সন্ধান পাওয়া যায় না। এইজন্যই মৃত্তিকার উপরিভাগে উদ্ভিদের খাদ্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। যদি কোন প্রয়োজনে ক্ষেত্রের উপরিস্থিত মৃত্তিকা স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা হইলে জীবাণুর অভাব হয়। তখন বহু গোময়-সার প্রয়োগ করিলেও ক্ষেত্রের উর্ব্বরতা বৃদ্ধি হয় না।

জল উদ্ভিদের একটি প্রধান খাদ্য। প্রাণিদেহের শিরা উপশিরা এবং ধমনী প্রভৃতি দিয়া রক্তধারা প্রবাহিত হয় এবং ইহাতে তাহাদের জীবনের কার্য্য অব্যাহত থাকে। উদ্ভিদের জীবনের কার্য্য অব্যাহত করিতে গেলে, তাহাদেরও সর্ব্বাঙ্গের খাদ্যরসের প্রবাহ অক্ষুণ্ণ রাখা প্রয়োজন। মূলের নিকটে জল না থাকিলে উদ্ভিদ দেহের এই রসপ্রবাহ অবরুদ্ধ হয়। এতদ্ব্যতীত উদ্ভিদের যে সকল খাদ্য বায়বীয় বা কঠিন পদার্থের আকারে মৃত্তিকায় থাকে, জলই সেগুলিকে শোষণ করিয়া বা দ্রব করিয়া উদ্ভিদের মূলের নিকটে লইয়া যায়। সুতরাং মৃত্তিকায় প্রচুর খাদ্য আছে, কিন্তু জল নাই, এইপ্রকার ঘটনা উপস্থিত হইলে, উদ্ভিদের জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়ে। বালুকাপ্রধান মৃত্তিকায় শতকরা চৌদ্দ ভাগ এবং এঁটেল মৃত্তিকায় শতকরা অন্ততঃ আঠার ভাগ জল থাকা একান্ত প্রয়োজন।

বৃষ্টির জল উদ্ভিদের পরম উপকারী। বারিবিন্দু বায়ুর ভিতর দিয়া ভূতলে পড়িবার সময়ে বায়ুরাশি হইতে যবক্ষারজান-ঘটিত আমোনিয়া-বাষ্প এবং কিঞ্চিৎ অঙ্গারক-বাষ্পও শোষণ করিয়া লয়। এই দুই বস্তু উদ্ভিদের প্রধান খাদ্য। সেই কারণে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ প্রভৃতি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে কূপের জলে কৃষিকার্য্য করা হয়। সাধারণতঃ এই জলে চূর্ণ ও লৌহঘটিত অনেক আকরিক দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। লৌহঘটিত বস্তু কৃষিকার্য্যের অনুপযোগী এবং চূর্ণও অধিক পরিমাণে ক্ষেত্রে থাকিলে ভূমির উর্ব্বরতা নষ্ট হয়। এই কারণে কূপের জল

সদ্য উত্তোলন করিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যবহার করা বিধেয় নহে। ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে কূপের জল যদি কিয়ৎকাল সূর্য্যালোকে এবং বায়ুতে উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে জলের অনেক দোষ নষ্ট হইয়া যায়! এই কারণে অভিজ্ঞ কৃষকগণ কূপের জল সোজা পথে ক্ষেত্রে লইতে চাহেন না; সাধারণতঃ আঁকা বাঁকা সুদীর্ঘ নালা কাটিয়া ইহা ক্ষেত্রে আনয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থায় ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বে বহুক্ষণ, বায়ুর সংস্পর্শ ও সূর্য্যালোক পাইয়া জল দোষশূন্য হইয়া যায়।

কোনও কোনও কূপের জল আবার উদ্ভিদের পরম উপকারী। এইপ্রকার সারযুক্ত জল "ক্ষারা পানী" নামে খ্যাত। কৃষকগণ ইহা আদরে ক্রয় করিয়া কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন।

দশরথের প্রতি কৈকেয়ী

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে
রঘুরাজ? কিন্তু দাসী নীচকুলোদ্ভবা,
সত্য-মিথ্যা জ্ঞান তার কভু না সম্ভবে।
কহ তুমি—কেন আজি পুরবাসী যত
আনন্দসলিলে মগ্ন? ছড়াইছে কেহ
ফুলরাশি রাজপথে; কেহ বা গাঁথিছে
মুকুল-কুসুম-ফল-পল্লবের মালা
সাজাইতে গৃহদ্বার—মহোৎসবে যেন?
কেন বা উড়িছে ধ্বজ প্রতি গৃহচূড়ে?
কেন পদাতিক, হয়, গজ, রথ, রথী
বাহিরিছে রণবেশে? কেনবা বাজিছে
রণবাদ্য? কেন আজি পুরনারীব্রজ
মুহুর্মুহু হুলাহুলি দিতেছে চৌদিকে?
কেন বা নাচিছে নট, গাইছে গায়িকা?
কেন এত বীণাধ্বনি? কহ, দেব, শুনি—
কৃপা করি কহ মোরে;—কোন্ ব্রতে ব্রতী
আজি রঘুকুলশ্রেষ্ঠ? কহ, হে নৃমণি,
কাহার কুশল হেতু কৌশল্যা মহিষী

বিতরেন ধনজাল ? কেন দেবালয়ে
বাজিছে ঝাঁঝরি, শঙ্খ, ঘণ্টা ঘটারোলে ?
কেন রঘু-পুরোহিত রত স্বস্ত্যয়নে ?
নিরন্তর জনস্রোত কেন বা বহিছে
এ নগর অভিমুখে ? রঘু-কুলবধু
বিবিধ ভূষণে আজি কি হেতু সাজিছে
কোন রঙ্গে ? অকালে কি আরম্ভিলা প্রভু
যজ্ঞ ? কি মঙ্গলোৎসব আজি তব পুরে ?
কোন রিপু হত রণে, রঘুকুলরথি ?
হা ধিক্ কি কবে দাসী—গুরুজন তুমি
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত—অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ ! প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে !
ধর্ম্মশব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে !
অযথার্থ কথা যদি বাহিরায় মুখে
কেকয়ীর, মাথা তার কাট তুমি আসি
নররাজ ! কিম্বা দিয়া চূণ-কালি গালে
খেদাও গহন বনে ; যথার্থ যদ্যপি
অপবাদ, তবে কহ, কেমনে দেখাবে
ও মুখ, রাঘবপতি, দেখ ভাবি মনে।
ধর্ম্মশীল বলি, দেব, বাখানে তোমারে
দেব নর—জিতেন্দ্রিয়, নিত্যসত্যপ্রিয় !

ত়বে কেন, কহ মোরে, তবে কেন শুনি,
যুবরাজ-পদে আজি অভিষেক কর
কৌশল্যা-নন্দন রামে ? কোথা পুত্র তব
ভরত—ভারতরত্ন, রঘুচূড়ামণি ?
পড়ে কি হে মনে এবে পূর্ব্বকথা যত ?
কি দোষে কেকয়ী দাসী দোষী তব পদে ?
কোন্ অপরাধে পুত্র, কহ, অপরাধী ?
তিন রাণী তব, রাজা, এ তিনের মাঝে,
কি ত্রুটি সেবিতে পদ করিল কেকয়ী
কোন্ কালে ? পুত্র তব চারি, নরমণি,
গুণশীলোত্তম রাম, কহ কোন গুণে ?
কি কুহকে, কহ শুনি কৌশল্যা-মহিষী
ভুলাইল মন তব ? কি বিশিষ্ট গুণ
দেখি রামচন্দ্রে, দেব, ধর্ম্ম নষ্ট কর,
অভীষ্ট পূর্ণিতে তার রঘুশ্রেষ্ঠ তুমি ?
কিন্তু বাক্যব্যয় আর কেন অকারণে ?
যাহা ইচ্ছা কর দেব, কার সাধ্য রোধে
তোমায়, নরেন্দ্র তুমি ; কে পারে ফিরাতে
প্রবাহে ? বিতংসে কেবা বাঁধে কেশরীরে ?
চলিল ত্যজিয়া আজি তব পাপ পুরী
ভিখারিণী-বেশে দাসী ! দেশ দেশান্তরে
ফিরিব ; যেখানে যাব, কহিব সেখানে,—

"পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুলপতি !
খোদিব এ কথা আমি তুঙ্গশৃঙ্গদেহে ;
রচি গাথা শিখাইব পল্লীবালদলে ;
করতালি দিয়া তারা গাইবে নাচিয়া—
"পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুলপতি !"
গম্ভীরে অম্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী,
এ মোর দুঃখের কথা, কব সর্ব্বজনে।
পথিকে, গৃহস্থে, রাজে, কাঙ্গালে, তাপসে,—
যেখানে যাহারে পাব, কব তার কাছে,—
পরম অধর্ম্মচারী রঘুকুলপতি !"
থাকে যদি ধর্ম্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্ম্মের প্রতিফল ; দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি ! দেখিব নয়নে
তব আশাবৃক্ষে ফলে কি ফল, নৃমণি !

আহার ও স্বাস্থ্যরক্ষা।

আহারের অনিয়মে যত রোগের উৎপত্তি হয়, সে প্রকার আর কিছুতেই হয় না। বাল্যকাল হইতে সকলেরই আহারে মিতাচারী হওয়া প্রয়োজন; নচেৎ বয়ঃপ্রাপ্তির পর স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া যায়। খাদ্য উদরস্থ হইয়া জীর্ণ না হইলে, তাহা শরীর-পোষণের বা দেহের ক্ষয়পূরণের কার্য্যে সাহায্য করে না। ইহাতে দিন দিন শরীর কৃশ ও দুর্ব্বল হয় এবং শেষে দেহে নানারোগ আশ্রয়গ্রহণ করে। এই প্রকারে কেবল অজীর্ণদোষে পৃথিবীর যে কত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

পচা এবং পর্য্যুষিত অর্থাৎ বাসি খাদ্য কখনই আহার করা উচিত নয়। অত্যন্ত উষ্ণ ভোজ্যদ্রব্যও অস্বাস্থ্যকর। সুসিদ্ধ ও সদ্যঃপ্রস্তুত খাদ্যই স্বাস্থ্যপ্রদ। আম, জাম, আনারস-প্রভৃতি অনেক ফলই সুখাদ্য এবং শরীরের উপকারী; কিন্তু অপক্ক অব-স্থায় এগুলির ন্যায় অপকারী খাদ্য আর নাই। কাঁচা কুল ও পেয়ারা-প্রভৃতি ভক্ষণ করিলে কখনই জীর্ণ হয় না, বরং পাকা-শয়ে গিয়া পাকযন্ত্রগুলিকে দুর্ব্বল করে। পাকযন্ত্র দুর্ব্বল হইলে স্বাস্থ্যকর লঘু খাদ্যও জীর্ণ হয় না।

যে সকল খাদ্য সুস্বাদু, সম্মুখে পাইলে তাহা আমরা আকণ্ঠ ভক্ষণ করি। নিমন্ত্রিত হইয়া কাহারও গৃহে আহার করিতে গেলে, আমাদের এইপ্রকার অতিভোজন প্রায়ই ঘটে। সুস্বাদু

খাদ্য পাইলে অত্যন্ত সংযমের সহিত এবং সাবধানে আহার করা কর্ত্তব্য। ঘন ঘন আহার করাকেই অতিভোজন বলা যাইতে পারে। পীড়া হইলে চিকিৎসক মহাশয় আমাদিগকে যে ঔষধ ব্যবহার করিতে বলেন, তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে সেবন করিতে হয়; নচেৎ ঔষধের কোন ফল পাওয়া যায় না। আহারসম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই বলা যাইতে পারে; নির্দ্দিষ্টসময়ে পরিমিত আহার করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, নচেৎ সুখাদ্য দ্রব্যগুলিও উদরস্থ হইয়া বিষের ন্যায় কার্য্য করে।

তোমরা বোধ হয় জান না, খাদ্য উদরস্থ হইলে প্রথমেই একপ্রকার পাকরস উদরে সঞ্চিত হইয়া পরিপাককার্য্য আরম্ভ করে। কিন্তু মনুষ্যের উদর হইতে প্রতিদিন সাত আট সেরের অধিক পাকরস কখনই নির্গত হয় না। কাজেই অধিক ভোজন করিলে ঐ রস সমস্ত খাদ্য জীর্ণ করিতে পারে না; ইহার ফলে কতক খাদ্য জীর্ণ এবং কতক অজীর্ণ অবস্থায় থাকিয়া নানা রোগের উৎপত্তি করে। অতিভোজনে পেট ফাঁপে এবং পেটে বেদনা আরম্ভ হয়। অজীর্ণ খাদ্যই এই সকল ব্যাধির কারণ। এই প্রকার খাদ্য শরীরে রক্ত উৎপন্ন না করিয়া, কেবল দূষিত বায়ুরই উৎপত্তি করিতে থাকে; তাহাতেই উদরাধ্মান এবং শূল-বেদনা প্রভৃতির সূত্রপাত হয়।

উত্তমরূপে চর্ব্বণ না করিয়া কোন খাদ্যই তাড়াতাড়ি ভক্ষণ করা উচিত নয়। ইহাতেও পরিপাক কার্য্যের বিঘ্ন হয়। আহার

সম্বন্ধে এই নিয়মটি পালন করে না বলিয়া অনেকে স্থায়ী অজীর্ণ রোগে কষ্ট পায়।

আমাদের মুখ সর্ব্বদাই লালায় সিক্ত থাকে। মুখে খাদ্য দিলে ইহা আপনা হইতেই প্রচুর পরিমাণে মুখবিবরে সঞ্চিত হয়। মুখের লালা খাদ্য-পরিপাকের প্রধান সহায়। আলু, ভাত, রুটি-প্রভৃতি খাদ্যে শ্বেতসার-নামক একপ্রকার উপাদান আছে; সাগুদানা এরোরুট্ প্রভৃতি দ্রব্যের প্রায় সকলই শ্বেতসার। শ্বেতসার লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইলে একপ্রকার চিনির আকার ধারণ করে, ঐ চিনি উদরের পাকরস ইত্যাদির সহিত মিলিয়া জীর্ণ হইয়া যায়। লালার সাহায্যে প্রথমে চিনিতে পরিণত না হইলে শ্বেতসার জীর্ণ হইতে পারে না।

মুখের লালা যে সত্যই খাদ্যের শ্বেতসারকে চিনিতে পরিণত করে, একটি সহজ পরীক্ষায় তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। গোধূম-চূর্ণ অর্থাৎ ময়দায় এবং তণ্ডুলে স্বভাবতঃ অধিক মিষ্ট স্বাদ নাই। তোমরা যদি আহারের সময়ে ঐ সকল খাদ্য বহুক্ষণ ভাল করিয়া চিবাইতে থাক, তবে তাহাতে ক্রমে মিষ্ট স্বাদ বুঝিতে পারিবে। রুটি ও ভাতের শ্বেতসার লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া মুখবিবরেই চিনি উৎপন্ন করে বলিয়া এই মিষ্ট স্বাদ জন্মে।

যাহা হউক, এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতেছ, খাদ্যের সহিত মুখের লালা না মিশিলে তাহা জীর্ণ হয় না। এই কারণেই

ভাল করিয়া চিবাইয়া এবং লালার সহিত মিশাইয়া খাদ্য উদরস্থ করা কর্ত্তব্য। তোমরা কখনই খাদ্য না চিবাইয়া তাড়াতাড়ি আহার করিও না। শিশুদের দন্ত নাই; কাজেই তাহারা খাদ্য চিবাইয়া ও লালার সহিত মিশাইয়া আহার করিতে পারে না। এই জন্য যাহাতে অধিক শ্বেতসার নাই, এইপ্রকার দ্রব্যই তাহাদের খাদ্য। শ্বেতসারবহুল কঠিন খাদ্য শিশুদিগের স্বাস্থ্যকর নয়।

অনেকে আহারের সময়ে বার বার জল পান করে। এই অভ্যাসটি অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। খাদ্য ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া লালার সহিত মিশাইলে, তাহা আপনা হইতেই গলা দিয়া নামিয়া যায়; খাদ্য গিলিবার জন্য জল পান করিলে, তাহা উদরে গিয়া পাকরসকে অত্যন্ত তরল করিয়া দেয়। ইহাতে পাক রসের শক্তি হ্রাস হইয়া আসে; কাজেই উদরস্থ খাদ্য জীর্ণ হইতে চায় না। আহারকালে জল বা কোন সরবত পানের অভ্যাস থাকিলে, তোমরা অদ্য হইতেই তাহা ত্যাগ করিও।

আহার করিতে করিতে পুস্তক পাঠ করা বা কোন প্রকার চিন্তা করা, অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই সময়ে মানসিক শ্রম করিলে পরিপাককার্য্যের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যদি নীরবে আহার করিতে না পার, তাহা হইলে তোমাদের ছোট ভাই ভগ্নীগুলির সহিত গল্প করিতে করিতে আহার করিও; ইহাতে উপকার হইবে। যে জগদীশ্বর সস্নেহে নিত্য নিত্য তোমাদের প্রয়োজনানুরূপ নানা সুখাদ্য সৃষ্টি করিতেছেন, যদি তাঁহার করুণার

কথা স্মরণ করিয়া আহারে বসিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের খাদ্য অমৃতময় হইয়া তোমাদের দেহে প্রবেশ করিবে। ব্রাহ্মণগণ যে ভোজনের পূর্ব্বে ভোজ্যদ্রব্য দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া লন ইহা একটি অতি উৎকৃষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত রীতি।

ইংরেজশাসনে ভারতবর্ষ।

গৃহ শান্তিময় এবং প্রতিবেশিবর্গ সৎ হইলে মানব শাকান্ন ভোজন ও জীর্ণ পর্ণকুটীরে বাস করিয়াও স্বর্গসুখ অনুভব করে। যাহার প্রতিবেশিবর্গ পরস্বাপহারী ও পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ দুর্ব্বৃত্ত ও মূর্খ, সে মানব কোটিপতি হইয়াও ক্ষণকালের জন্য সুখানুভব করিতে পারে না; তাহার ধর্ম্মকর্ম্ম সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। পারিবারিক সুখ এবং প্রতিবেশীদিগের সদ্ব্যবহারই মানবজীবন সার্থক করে। মূর্খ পরিবার এবং দুর্ব্বৃত্ত প্রতিবেশীর মধ্যে যাহার বাস, পশুদিগের ন্যায় আত্মরক্ষা করিতেই তাহার জীবন অতিবাহিত হয়। সুতরাং মানবসুলভ উচ্চবৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তি-সাধনে তাহার অবকাশ থাকে না।

ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার কথা চিন্তা করিলে, ইংরেজরাজ দুর্ব্বৃত্তকে দমন করিয়া এবং জনসাধারণকে সুশিক্ষা দিয়া গার্হস্থ্য-জীবনে যে সুখশান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহার কথাই

সর্ব্বাগ্রে মনে উদিত হয়। লোকশিক্ষার এ প্রকার সুব্যবস্থা এবং শান্তিরক্ষার এমন সুবিধান কোন কালে ভারতে প্রচলিত ছিল না। বর্ত্তমান সময়ে প্রায় একলক্ষ পঞ্চদশসহস্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিদ্যালয় রাজোদ্যোগে এবং রাজব্যয়ে এই বিশাল সাম্রাজ্যের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, এবং প্রায় চল্লিশ লক্ষ ছাত্র এই সকল বিদ্যালয়ে নানাবিধ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কেবল বিদ্যালয়ের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য রাজকোষ হইতে প্রায় পাঁচ কোটি মুদ্রা প্রতিবৎসরই ব্যয়িত হয়। স্ত্রীশিক্ষাবিধানেও রাজা উদাসীন নহেন; রাজব্যয়ে নগরে নগরে চৌদ্দহাজারের অধিক বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয়গুলির মধ্যে উচ্চশিক্ষাদানের জন্য কয়েকটি কলেজও আছে। সহস্র-সহস্র বালিকা এই ব্যবস্থায় সুশিক্ষা লাভ করিয়া সুগৃহিণী হইতেছেন। যে দেশে বালকবালিকাদিগের শিক্ষাদানের এ প্রকার সুব্যবস্থা, সে দেশে যে গার্হস্থ্যজীবন উত্তরোত্তর অধিক শান্তিময় হইবে, তাহা আশা করা কি অন্যায়?

ভারতের প্রত্যেক জেলায় এবং প্রত্যেক জেলার নানা জনবহুল নগরে বা গ্রামে বিচারালয় সংস্থাপন করিয়া ইংরাজরাজ ভারতে যে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহাও অপূর্ব্ব। কোটিপতি ভূম্যধিকারী হইতে পথের ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকল প্রজাই বিচারপ্রার্থী হইয়া বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে পারে। ইংরাজরাজের প্রদত্ত এই অধিকার ভারতীয় প্রজাদিগের যে কত অশান্তির নিরাস করিতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ভারত-

সাম্রাজ্যে প্রায় সাতলক্ষ গ্রাম্য শান্তিরক্ষক এবং একলক্ষ ত্রিশহাজার ছোট-বড় পুলিশ কর্ম্মচারী পরস্বলোলুপ দুর্ব্বৃত্তগণের দমনে সর্ব্বদাই তৎপর। প্রাচীন কালের দস্যুতস্করাদির ভীষণ অত্যাচারের কথা এক্ষণে সত্যই যেন উপন্যাসের বিষয় হইয়াছে।

প্রজাদিগকে সুশিক্ষা দান করিয়াই রাজা নিবৃত্ত নহেন, শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যাহাতে জীবনে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারেন, তৎপ্রতিও রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে। সাধারণ শিক্ষার শেষে যুবকদিগকে বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের উপযোগী করিবার জন্য ঢাকা, কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ এবং লাহোর প্রভৃতি স্থানে শিল্পবিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইন-বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে; এবং পুষা ও অন্যত্র কৃষিবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঢাকা, কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি নগরের মেডিকেল-কলেজগুলি ভারতবাসীদিগকে আধুনিক যুগের উন্নত চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভপূর্ব্বক সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বা রাজকর্ম্মচারিরূপে নিযুক্ত হইয়া পরমসুখে দিনযাপন করিতেছেন। ভারতের সহস্র সহস্র গ্রামে ও নগরে প্রজাগণের সুচিকিৎসার জন্য যে সকল সরকারী দাতব্যচিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহাতেও সরকারি-মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ চিকিৎসক-রূপে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পরম দয়াবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে ভারতসাম্রাজ্যের শাসনভার স্বয়ং গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে শিক্ষিত ভারতবাসিগণ যে সকল নব নব অধিকার উপভোগ করিতেছেন, তাহা অতুলনীয়। উপযুক্ত হইলে শিক্ষিত ভারতবাসী যাহাতে রাজকর্ম্মচারিরূপে উচ্চপদে নিযুক্ত হইতে পারে, শাসনভারগ্রহণকালে করুণাময়ী মহারাণী তাহার সুব্যবস্থা করিয়া বিশাল সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র তাহা ঘোষণা দ্বারা প্রচার করেন। রাজা ও রাজপ্রতিনিধিগণের উদার শাসননীতির ফলে সেই অধিকারই এত প্রসারলাভ করিয়াছে যে, হাইকোর্টের বিচারপতি, কমিশনার, ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর প্রভৃতি পদে এক্ষণে বহুসংখ্যক ভারতবাসী সমাসীন আছেন। কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালকগণেরও অধিকাংশ ভারতবাসী। রাজপ্রতিনিধির যে মন্ত্রণাসভায় সমগ্র ভারতের জন্য ব্যবস্থাপ্রণয়ন এবং শাসনপদ্ধতির সংস্কার হয়, তাহাও ভারতবাসীর নিকটে অবারিতদ্বার। শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের গৌরবস্থল মান্যবর সার্ শঙ্কর নায়ার এক্ষণে রাজপ্রতিনিধির শিক্ষাসচিবপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইংলণ্ডে ভারতসচিব মহোদয়ের যে সভা আছে, তাহাতেও একাধিক ভারতবাসী স্থান পাইয়াছেন। বঙ্গের পরম গৌরব শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ঐ সভার সদস্য পদ লাভ করিয়া স্বদেশের সুশাসনের সহায়তা করিতেছেন। সম্প্রতি ভারত সচিব

মিঃ মণ্টেগু ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড চেমস্‌ফোর্ড ভারতবাসিগণকে আরও অধিক রাজনৈতিক অধিকার দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

আমরা এক্ষণে যাহাকে রাজপথ বলিয়া আখ্যাত করি, সে প্রকার পথ ইংরেজরাজ শাসনভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ভারতে অধিক ছিল না। সে সময়ে মির্জাপুর হইতে দক্ষিণ-ভারতে গমনাগমন করিবার পথটি সুদীর্ঘ বলিয়া খ্যাত ছিল। এতদ্ব্যতীত আগরা হইতে আজমীর, এলাহাবাদ হইতে জব্বলপুর এবং দিল্লী হইতে এলাহাবাদ ও পাটনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত কয়েকটি দীর্ঘ পথ এবং অক্ষয়কীর্ত্তি শের শাহের নির্ম্মিত গ্রাণ্ড্‌ট্রাঙ্করোড দেশবিদেশের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিত। পথগুলি সুরক্ষিত করিবার জন্য শাসনকর্ত্তৃগণ পথিমধ্যে শান্তিরক্ষক নিযুক্ত রাখিতেন। ব্যবসায়িগণ গোযান ও অশ্ব প্রভৃতি পশুর পৃষ্ঠে ব্যবসায়ের দ্রব্যজাত চাপাইয়া দলে দলে বিদেশযাত্রা করিত। বলা বাহুল্য, পণ্যবহনের এই প্রকার ব্যবস্থা নিরাপদ্ ছিল না; দস্যুতস্করের উপদ্রবে অনেকের সর্ব্বনাশ হইত। তখন এ দেশে তাড়িত বার্ত্তাবহন-প্রথার প্রচলন ছিল না; উৎপাতের সংবাদ রাজপুরুষদিগের কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বেই দস্যুরা নিরাপদ্ স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিত।

ইংরেজরাজের চেষ্টায় ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রথম রেল-পথের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। সেই সময় হইতে ধীরে ধীরে ব্যবসায়ী

ও পথিকদিগের সকল বিপদ্ একে একে দূরীভূত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রথমে কেবল পাঁচ হাজার মাইল রেলপথের নির্ম্মাণ হয়; এক্ষণে তাহাই প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল দীর্ঘ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া, সমগ্র সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ব্যবসায়িগণ ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে বহুমূল্য দ্রব্যজাত প্রেরণ করিয়া কেমন নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। অষ্টাবিংশতি মণ দ্রব্য রেলযোগে অর্দ্ধক্রোশ লইয়া যাইতে দুই পয়সার অধিক ব্যয় হয় না। ব্যবসায়দ্রব্যবহনের এই সুব্যবস্থায় বণিক্সম্প্রদায় যেমন লাভবান্ হইতেছেন, ভারতের অধিবাসি-গণও বিদেশজাত নানা প্রয়োজনীয় বস্তু স্বল্পমূল্যে পাইয়া তেমনি সুবিধা ভোগ করিতেছেন। রেলপথ-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বোম্বাই, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব এবং কাশ্মীর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান-গুলির সহিত আমাদের এত অল্প পরিচয় ছিল যে, সেই সকল স্থানের অধিবাসিগণ কোন্ ভাষায় কথোপকথন করে এবং তাহাদের দেশের অবস্থাই বা কি প্রকার, অনেকেই তাহা জানিত না। দিল্লী, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নগরগুলিও অধিকাংশ লোকের নিকট শৈশবোপাখ্যানের রাজপুরীর ন্যায় রহস্যময় ছিল। সম্প্রতি রেলপথের বিস্তারের সহিত অল্পব্যয়ে এবং নিরাপদে দূরদেশে যাতায়াতের সুযোগ হওয়ায়, ভারতের অধিবাসিবর্গের যে, কত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা বর্ণনাতীত। এই সকল সুযোগ যে কোন কালে উপস্থিত হইবে, এক শত

বৎসর পূর্ব্বেও কোন ভারতবাসী তাহা মনে করিতে পারিতেন না।

দূরদেশস্থিত অধিবাসীদিগের সহিত সংবাদ আদানপ্রদানের কোন সুবিধা না থাকায়, পূর্ব্বে ব্যবসায়ের উন্নতি বা বিদ্যার্জ্জনের জন্য কোন ভারতবাসী সহসা গৃহত্যাগ করিতেন না; অধুনা স্বল্প ব্যয়ে পত্র-আদানপ্রদানের সুবিধা হওয়ায়, সেই ভাব ক্রমেই দূর হইয়া যাইতেছে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরাজ ভারতে ডাকবিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময় হইতেই সর্ব্বপ্রথম রাজকীয় পত্রাদির সহিত জনগণের পত্রাদিও বহন করা হইত; প্রথমে দূরত্বানুসারে অগ্রিম মাশুল গ্রহণ করিবার রীতি ছিল। এই হিসাবে কলিকাতা হইতে আগরায় পত্র পাঠাইতে প্রেরকের বার আনা ব্যয় হইত। এক্ষণে কেবল এক পয়সা ব্যয়ে ভারতের যে কোন অংশে পত্র প্রেরিত হইতেছে, এবং প্রয়োজন হইলে, অতি যৎসামান্য ব্যয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারযোগে সংবাদের আদান-প্রদান চলিতেছে। ইহাতে বর্ত্তমান ভারতের অধিবাসিগণ নিরুদ্বেগে প্রিয়জন হইতে দূরে অবস্থান করিয়া জ্ঞান ও অর্থ উপার্জ্জনপূর্ব্বক নৈতিক মানসিক ও বৈষয়িক সর্ব্ববিধ উন্নতির ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন।

মাতাপিতা যেমন নিঃসহায় সন্তানের পরম আশ্রয়, সঙ্কটাপন্ন প্রজাগণেরও রাজাই সেইরূপ পরম অবলম্বন। মহামারী বা দুর্ভিক্ষের সময় রাজা পীড়িতের শুশ্রূষা এবং অনাহারক্লিষ্টের

আহারের ব্যবস্থা না করিলে প্রজাগণের উদ্ধারের যথোচিত ব্যবস্থা অসম্ভব। ভারতসাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ প্রজা বহু বার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া রাজানুকূল্য লাভ করিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী বলিয়া কোন বৎসরে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইলেই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষের এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাবনিবারণে মানবী শক্তিকে অসমর্থ দেখিয়া রাজপ্রতিনিধিগণ এই ভীষণ রাক্ষসের সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন। প্রতি বৎসর রাজকোষ হইতে নির্দ্দিষ্টপরিমাণ অর্থ দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের সাহায্যার্থ পৃথগ্‌-ভাবে রক্ষা করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট্‌গণ স্ব স্ব জেলার শস্যাদির অবস্থার বিবরণ প্রতি সপ্তাহের শেষে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের নিকট প্রেরণ করেন, এই সকল বিবরণ হইতে কোন স্থানে অন্ন কষ্টের সম্ভাবনা প্রকাশ পাইলে, দরিদ্র প্রজাদিগকে সাহায্যদানের অয়োজন চলিতে থাকে। তৎপরে যথার্থ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইলে, নানাবিধ পূর্ত্তকার্য্যে দরিদ্র প্রজাদিগকে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত পারিশ্রমিক-দান আরব্ধ হয়। ইহাতে শ্রমজীবিগণের অন্নাভাব দূর হয় ও সর্ব্বসাধারণেরও সুবিধা হয়।

দুর্ভিক্ষ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিলে, এই প্রকার সাহায্য যথেষ্ট হয় না। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব এবং তাঁহার সহকারী-দিগের তত্ত্বাবধানে স্থানে স্থানে অন্নসত্র এবং সাহায্যভাণ্ডারের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক সময়ে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব স্বয়ং তণ্ডুল ও অন্নবিতরণকার্য্য পরিদর্শন করেন, এবং প্রাদেশিক

শাসনকর্ত্তৃগণ অপর রাজকার্য্য হইতে বিরত হইয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের অবস্থাদর্শনে বহির্গত হয়েন। বিশাল ভারত-সাম্রাজ্যের যে অংশে যে খাদ্য পাওয়া যায়, রাজকর্ম্মচারিগণ তাহা উচ্চমূল্যে ক্রয় করিয়া রেল ও ষ্টীমারযোগে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন; রেল ও ষ্টীমার কোম্পানীও তখন রাজাদেশে দুর্ভিক্ষপীড়িতের সাহায্যার্থ খাদ্য প্রেরণের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে করিতে বাধ্য হন। ঊনবিংশ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, আজমীর ও পঞ্জাবের কিয়দংশে যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, তাহাতে প্রায় ষড়্বিংশতি লক্ষ নিঃসহায় ব্যক্তি রাজার কৃপায় জীবনলাভ করিয়াছিল। ইহাতে রাজকোষ হইতে প্রায় দশকোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

যে খৃষ্টান সাধুগণ ধর্ম্মপ্রচারোদ্দেশ্যে নগরে নগরে অবস্থান করেন, তাঁহারাও এই সঙ্কটকালে অল্প সাহায্য করেন না। গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া অনাহারক্লিষ্ট-লোকদিগকে আহার্য্য ও নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিয়া ইঁহারা যে কত লোকের জীবনরক্ষা করিয়াছেন, তাহা গণনাতীত।

এ দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে স্বয়ং সম্রাট্ও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। রাজপ্রতিনিধি ও প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তৃগণের সহিত তাঁহার সর্ব্বদা সংবাদের আদানপ্রদান চলিতে থাকে। করুণহৃদয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া এবং শান্তিপ্রিয় প্রজাবৎসল সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড এই প্রকার দৈববিপদে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া রাজপ্রতিনিধিদিগকে যে সকল পত্র

লিখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদিগের আন্তরিক প্রজাহিতৈষণার জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ। ভূমণ্ডলব্যাপী বৃহৎ সাম্রাজ্যের কোন অংশে প্রজাবৃন্দের কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিলেই, প্রজা-দুঃখকাতরা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কোমল হৃদয় দ্রবীভূত হইত, এবং তিনি প্রজার বিপদ্‌কে পারিবারিক বিপদ্‌জ্ঞানে সাশ্রুনয়নে পরমেশ্বরের নিকট করুণাভিক্ষা করিতেন।

প্রকৃতিপুঞ্জের কল্যাণকামী রাজা কদাপি দূর হইতে শাসন-সৌকর্য্যের বিবিধ ব্যবস্থা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, প্রজাবৃন্দের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত তাঁহার সতত আগ্রহ থাকে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি একবার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া দেশবাসীর অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। আমাদের বর্ত্তমান সদাশয় সম্রাট্ সিংহাসনপ্রাপ্তির পূর্ব্বে একবার এবং সাম্রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, সৌজন্য ও দানশীলতা ভারতীয় প্রজাসমূহ কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিবে না। সেই সময়ে তিনি শিক্ষাবিস্তারকল্পে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া, মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। কলিকাতায় অবস্থান-কালে সাধারণ বেশে নগরভ্রমণ করিয়া তিনি কত দীন-দরিদ্রের সহিত আলাপ করিয়াছেন। যে দিন দিল্লীনগরে অতি সমারোহে তাঁহার অভিষেকোৎসব সুসম্পন্ন হয়, সেই দিন ভারতীয় রাজন্যবর্গ

ও প্রজাসমূহ তাঁহার রাজচ্ছত্রতলে আপনাদের সম্মিলিত শক্তি অনুভব করিয়া সাধুচরিত্র সম্রাটের দীর্ঘ-জীবন কামনা করিয়াছিলেন।

এইরূপে রাজা ও প্রজা এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুখে দুঃখে যে হৃদয়ের যোগ স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমান ভারত-শাসন পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

গৌড়ের কীর্ত্তিচিহ্ন।

আধুনিক মালদহের নিকটবর্ত্তী গৌড়ে বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলমান-স্থাপত্যের ত্রিধারার যে অপূর্ব্ব মিশ্রণ দেখা যায়, ভারতের অতি অল্প স্থানেই তাহা দৃষ্ট হয়। কোন্ সময়ে কোন্ রাজা গৌড়ে প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন, ইতিহাসে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উল্লেখ দেখিয়া অনেকে মনে করেন, ইহাই সেই প্রাচীন নগর। ইহা তৎকালে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পাল নরপতিগণের রাজধানী ছিল। ইঁহাদের রাজ্যই কালক্রমে সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত এবং তৎপরে মুসলমান নরপতিগণের করতলগত হয়। সুতরাং গৌড়, বৌদ্ধ হিন্দু ও মুসলমান এই ত্রিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী নরপতি-গণের রাজলক্ষ্মীর লীলাভূমি। তৃণগুল্মাচ্ছাদিত যে রাজবর্ত্ম

এখন শ্বাপদকুলের বিচরণপথ হইয়াছে, তদ্দ্বারা এককালে বহু হিন্দু, মুসলমান ও বৌদ্ধ নরপতি বিজয়যাত্রায় বহির্গত হইতেন। গৌড়ের ভগ্ন তোরণ, সমাধিমন্দির, ভজনালয় প্রভৃতি হিন্দু মুসলমান ও বৌদ্ধ স্থাপত্যচিহ্ন ধারণ করিয়া অদ্যাপি পূর্ব্ব সমৃদ্ধির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

যাঁহারা প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন পরিদর্শন করিতে গৌড়-অঞ্চলে গমন করেন, প্রথমেই আদিনা মস্‌জিদ তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এত বৃহৎ এবং এত সুন্দর মস্‌জিদ ভারতে অতি অল্পই দেখা যায়। প্রসিদ্ধ মুসলমান নরপতি সামসুদ্দিন ইলিয়াসের বংশধর সুলতান সেকেন্দর সাহের রাজত্বকালে এই কারুকার্য্যময় মস্‌জিদের নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। চতুর্দ্দিকে বহু প্রকোষ্ঠ এবং মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ এখনও আদিনার পূর্ব্বতন গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বাহ্য সৌন্দর্য্যের তুলনায় ইহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যই অধিক। অভ্যন্তরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির মধ্যে "বাদশাহ তখ্‌ত" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রায় আট হাত উচ্চ একটি সুবিস্তৃত শিলাময় উপাসনামঞ্চ এই নামে খ্যাত। ইহারই পুরোভাগে কৃষ্ণমর্ম্মরনির্ম্মিত কারুকার্য্যময় যে এক প্রাচীর বর্ত্তমান, তাহার সৌন্দর্য্য আজও অতুলনীয় রহিয়াছে। আদিনার প্রত্যেক ইষ্টক ও প্রস্তর অতুল কারুকার্য্যময়। বঙ্গে মুসলমান আমলে স্থাপত্যবিদ্যা যে কত উন্নত ছিল, আদিনা মস্‌জিদ দেখিলে তাহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়।

আদিনা মস্‌জিদের পরেই কয়েকটি অতি প্রসিদ্ধ ভগ্ন

অট্টালিকা দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহাদের একটির নাম বারদুয়ারী।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত বিদ্যানুরাগী বাদসাহ হোসেন সাহের পুত্র সুলতান নসরৎ সাহের রাজত্বকালে বারদুয়ারী নির্ম্মিত হয়। ইহা একটি জুম্মা-মস্‌জিদ। তাহার পূর্ব্বদিকে বৃহৎ প্রাঙ্গণ বর্ত্তমান, এবং যাহাতে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে সহস্র সহস্র উপাসক অনায়াসে মস্‌জিদে প্রবেশ করিতে পারে, তজ্জন্য তিনটি তোরণ দণ্ডায়মান। স্বয়ং বাদসাহ এই মস্‌জিদেই প্রজামণ্ডলীর সহিত একত্র নমাজ পড়িতেন। ইহার সৌন্দর্য্য অপর অট্টালিকা অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। এই মস্‌জিদের সকল প্রকোষ্ঠেই যে সকল সুবিন্যস্ত খিলান আছে, সেগুলি অতি সুন্দর। বারদুয়ারী নির্ম্মাণে বাদসাহের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। এই নিমিত্ত অনেকে ইহাকে সোণা-মস্‌জিদও বলিয়া থাকে।

সোণামস্‌জিদের নিকটেই দুর্গতোরণ "দখল-দরওজা" বিদ্যমান এবং তাহারই অনতিদূরে "ফিরোজ-মিনার" অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর কোন সময়ে বার্ব্বকসাহ নামক বাদসাহ পূর্ব্বোক্ত দুর্গতোরণ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে দুর্গপ্রাকারের বাহিরে ফিরোজ-মিনার নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন, সম্ভবতঃ উপাসকমণ্ডলীকে ভজনালয়ে আহ্বান করিবার জন্যই ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ আবার ইহাকে "প্রহরি-

মন্দির” বলিয়াও অনুমান করেন। যাহা হউক, এই ৫৪ হাত দীর্ঘ মিনার যেরূপ বৃহৎ, সেইরূপ রমণীয়; এককালে যে প্রকাণ্ড কারুকার্য্যময় গম্বুজ ইহার শোভা বর্দ্ধন করিত, এখন তাহা নাই, এবং ইহার সোপানাবলীও এখন ভগ্নদশাপন্ন, তথাপি সৌন্দর্য্যে ইহা অনেক প্রাচীন অট্টালিকাকে পরাভব করিতেছে। কথিত আছে, ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে আবিসিনীয় বাদসাহ মালেক ইদ্দিল ফিরোজ-মিনার নির্ম্মাণ করেন। আশা পীর নামক জনৈক বিখ্যাত ফকীর ইহাতে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। স্থানীয় নিরক্ষর কৃষকদিগের নিকট প্রাচ্য শিল্পের আদর্শস্থানীয় এই মিনারটি “চেরাক্‌দানী” নামে খ্যাত।

লোটুন-মস্‌জিদের ধ্বংসাবশেষ গৌড়ের আর একটি দর্শনীয় বস্তু। বহু জনশ্রুতি এই প্রাচীন মস্‌জিদের সহিত জড়িত রহিয়াছে। কোন্ বাদসাহ-কর্ত্তৃক কোন্ সময়ে ইহার নির্ম্মাণ হয়, ঐতিহাসিকগণ তাহা অদ্যাপি স্থির করিতে পারেন নাই। মস্‌জিদটি দীর্ঘ সরোবর-তীরে অবস্থিত। যে সকল ইষ্টক ও প্রস্তরে ইহা নির্ম্মিত, তাহাদের বিচিত্র বর্ণ এবং সুন্দর বিন্যাস পরম মনোরম। উত্তরভারতে লোটুন-মস্‌জিদের ন্যায় উৎকৃষ্ট ভজনালয় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বোক্ত মস্‌জিদের দক্ষিণে “কোতয়ালীদ্বার” নামে যে প্রহরিমন্দির আছে, তাহাও আর একটি দর্শনীয় বস্তু। ৮৬০ হিজরী শকে বাদসাহ মামুদ সাহের রাজত্বকালে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার দৃশ্য দূর হইতে অতি সুন্দর দেখায়।

এতদ্ব্যতীত গৌড়ে নগরপ্রাচীরের ভগ্নাবশেষ, "একলক্ষী", "রামকেলী" এবং "কদমরসুল" প্রভৃতি যে শত শত ভগ্ন অট্টালিকা আছে, সেগুলিরও শিল্পনৈপুণ্য দর্শককে স্তম্ভিত করে। অতি প্রাচীন কালে যখন গৌড় হিন্দু ও বৌদ্ধ নরপতিদিগের অধিকারে ছিল, সে সময়ের যে দুই একটি কীর্ত্তি-চিহ্ন আছে, তাহাও চমৎকার-জনক।

"কদমরসুল" ইস্‌লামধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, গৌড়েশ্বর হোসেন সাহ আরব দেশের মদিনা হইতে ইহা রাজধানী গৌড়ে আনয়ন করেন। ইঁহারই পুত্র নসরৎ সাহ এক সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে "কদমরসুলের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখন সেই মস্‌জিদই "কদমরসুল" নামে খ্যাত। কিন্তু ইহাতে আর "কদমরসুল" নাই। তাহা কোথায় কিরূপে স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহা কেহ স্থির করিতে পারে নাই।

গৌড় হতশ্রী হইয়াছে সত্য, কিন্তু যতদিন তাহার শত শত মস্‌জিদের এক খণ্ড কারুকার্য্যখোদিত ইষ্টক বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ইহার স্মৃতি বঙ্গদেশ হইতে লোপ পাইবে না। প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের আদর্শস্বরূপ বহু সুন্দর মস্‌জিদে বট ও অশ্বত্থ-প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিয়া, সেগুলিকে ক্রমেই ধরাশায়ী করিতেছিল; সদাশয় ইংরেজরাজ বৃক্ষাদি কর্ত্তন করিয়া এবং বহুব্যয়ে অনেক পতনোন্মুখ মস্‌জিদ ও মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়া সেগুলিকে রক্ষা করিয়াছেন। কেবল বঙ্গদেশে নয়, ভারতে সর্ব্বত্র এইরূপ

প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহের জীর্ণসংস্কার করিয়া ইংরেজরাজ তাঁহার সহৃদয়তার এবং প্রজারঞ্জনবৃত্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছেন।

ভারতের প্রাকৃতিক সংস্থান।

ভারতবর্ষ প্রকৃতির এক অতি বিশাল ও অতি বিচিত্র লীলাভূমি। ইহার কোথাও উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতমালা, কোথাও বা বিস্তীর্ণ গ্রীষ্মপ্রধান মালভূমি; কোথাও বারিহীন বালুকাময় মরুস্থলী, কোথাও বা নদনদীসেবিত শস্যশ্যামল ভূভাগ; কোথাও সমৃদ্ধ জনাকীর্ণ নগরী ও জনপদরাজি, কোথাও বা ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল বিজন অরণ্য। ইহার দৈর্ঘ্য কুমারিকা অন্তরীপ হইতে কাশ্মীরের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত প্রায় দুই সহস্র মাইল এবং প্রাশস্ত্যও ব্রহ্মদেশের পূর্ব্বসীমা হইতে বেলুচি-স্থানের পশ্চিম সীমাপর্য্যন্ত প্রায় তৎপরিমাণ। এই বিশাল দেশের নানা ভাগে নানাজাতি লোক বাস করে। আচার, ব্যবহার, ভাষা, শিক্ষা, সভ্যতা-প্রভৃতি বিষয়ে ইহাদের পরস্পরের মধ্যে নানারূপ প্রভেদ বর্ত্তমান। ভারতের নানা প্রদেশের জলবায়ুর প্রকৃতিও ভিন্ন। এই সকল কারণে কোনও

কোনও লেখক ভারতবর্ষকে এক স্বতন্ত্র মহাদেশ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন।

বিন্ধ্য পর্ব্বত ও সাতপুরা পর্ব্বত-শ্রেণী মেখলার ন্যায় ভারতভূমির কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহাকে ঊর্দ্ধ (উত্তর) ও অধঃ (দক্ষিণ) এই দুইভাগে বিভক্ত করিতেছে। ঊর্দ্ধ-ভাগের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। অধোভাগের নাম দক্ষিণাপথ। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলে মনে হয়, যেন ভারতের দক্ষিণ-ভাগ জলধির জলে অবগাহন করিবার জন্য ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অগ্রসর হইয়াছে। এই অংশ ত্রিভুজাকার, উন্নত ও স্থানে স্থানে বন্ধুর।

মান্দ্রাজ, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ ও মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য এই বিশাল ও উন্নতাবনত উচ্চ ভূভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমান্তের পর্ব্বতশ্রেণী উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া হিমালয়ের পাদপ্রান্ত-পর্য্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ সমতল ভূভাগকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে পর্ব্বতের অভাব নাই; পূর্ব্বঘাট ও পশ্চিমঘাট-নামক শৈলশ্রেণী দক্ষিণ ভারতকে প্রাচীরবৎ বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্বঘাটের উচ্চতা সাগর-পৃষ্ঠ হইতে গড়ে সহস্র ফুট; কিন্তু পশ্চিমঘাটের উচ্চতা আট হাজার ফুট। দক্ষিণাপথের উচ্চ ভূভাগ পশ্চিমঘাট হইতে ক্রমনিম্ন হইয়া পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই জন্য এই অংশের অনেক নদীও পূর্ব্ববাহিনী।

হিমালয়ের পাদমূল হইতে আরম্ভ করিয়া যে ভূভাগ উত্তর

কাশ্মীরের দৃশ্য ।

ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তাহাকে মোটের উপর সমতলই বলা যাইতে পারে। ইহারই মধ্যাংশে যুক্তপ্রদেশ; উত্তরপশ্চিমে পঞ্জাব, রাজপুতনা ও সিন্ধুপ্রদেশ; এবং উত্তর-পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ও আসাম অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু প্রভৃতি নদ এবং গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীর প্রবাহ এই পাঁচলক্ষ বর্গমাইল-পরিমাণ বিশাল ভূভাগের সরসতা ও উর্ব্বরতা সাধন করিতেছে।

এই সরস উর্ব্বর ভূভাগে প্রাচীন কাল হইতে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। এই প্রদেশেই প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান-সভ্যতার ধারাযুগল প্রবাহিত হইয়া বিদ্যা, জ্ঞান ও শিল্পকলায় সমগ্র ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল। বঙ্গের রাজধানী কলিকাতা নগরী এবং শিলং, দার্জ্জিলিং, নৈনিতাল, সিমলা, প্রভৃতি ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমৃদ্ধ নগরগুলিও এই প্রদেশে অবস্থিত। এই জন্য ইহাকে আধুনিক সভ্যতারও লীলাভূমি বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। মধ্য-প্রদেশ ও দক্ষিণাপথের পর্ব্বতসঙ্কুল অসম ভূভাগকে প্রকৃতি দেবী যে সকল আভরণে সজ্জিত করিয়া এত রমণীয় করিয়া তুলিয়াছেন, উত্তরভারত তাহা লাভ করে নাই সত্য, কিন্তু ইহার প্রায় সমতল বক্ষের উপর দিয়া যে অমৃতনিষ্যন্দিনী গঙ্গা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু প্রভৃতি নদ শত বাহু বিস্তার করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহারাই এই সমতল ভূভাগের বৈচিত্র্য-বিধানের পক্ষে যথেষ্ট।

দক্ষিণভারতে গঙ্গার ন্যায় দীর্ঘ নদী নাই। কিন্তু নর্ম্মদা

নামে যে স্বচ্ছতোয়া নদী অমরকণ্টকে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বোম্বাই প্রদেশকে ধনধান্যশালী করিয়াছে, উত্তরভারতের গঙ্গার সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে। গঙ্গার ন্যায় ইহারও উভয় কূলে অসংখ্য দেবমন্দির বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত অনেক পৌরাণিক ঘটনার সহিত এই নদীর নাম জড়িত থাকায়, হিন্দুগণ ইহাকে গঙ্গার ন্যায় পূতসলিলা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। জব্বলপুরের নিকটে নর্ম্মদাবক্ষ ভেদ করিয়া এক মর্ম্মরপর্ব্বত দণ্ডায়মান আছে। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে। দিল্লী, ফতেপুর-শিক্রি, লক্ষ্ণৌ, অমৃতসর, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে হিন্দু ও মুসলমান নরপতিদিগের কীর্ত্তি এবং সিমলা, দারজিলিং, কলিকাতা প্রভৃতি ইংরাজপ্রতিষ্ঠিত স্থানের সৌন্দর্য্যের ন্যায় জব্বলপুরের মর্ম্মরপর্ব্বতও বিদেশীয় পর্য্যটকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং মনোহরণ করিয়া থাকে। খরবাহিনী তাপ্তী নদীর উভয় কূলের দৃশ্যও পরম মনোরম।

দক্ষিণভারতের অপর নদীসমূহের কথা মনে করিলে নর্ম্মদা ও তাপ্তীর পরেই গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরীর কথা স্মরণপথে উদিত হয়। গোদাবরীই এই প্রদেশের শ্রেষ্ঠ নদী। বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে উৎপন্ন হইয়া এই স্রোতস্বতী নিজাম বাহাদুরের রাজ্য ভেদ করিয়া ভারতের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী সাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা যে কত তৃণগুল্মহীন শুষ্ক প্রান্তর ভেদ করিয়া এবং কত দুর্গম আরণ্যভূমির শ্যামল বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া

সাগরে পতিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। গোদাবরীতে বৎসরের সকল সময়ে গভীর জল থাকে না বলিয়া জলযানে গমনাগমনের সুযোগ নাই। রাজমহেন্দ্রী হইয়া পঁচিশ মাইল দূরে গোদাবরীর দৃশ্য অতিচমৎকার। নদীতীরবর্ত্তী শৈলশ্রেণীর উপরে নিবিড় বেণুবন এবং ঘনসন্নিবিষ্ট প্রাচীন সেগুন, তিন্তিড়ী ও ডুম্বুর-জাতীয় বৃক্ষ অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। ইউরোপের রাইন্ নদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু গোদাবরীর এই অংশের সৌন্দর্য্য রাইনের শ্রীকেও পরাভব করিয়াছে।

কৃষ্ণা ও কাবেরী নদীদ্বয়ও ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত শৈলশ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের কোন নদীই গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় গভীর নয়। ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি নদী দূর-দূরান্তর হইতে জলরাশি বহন করিয়া কৃষ্ণায় যুক্ত হইয়াছে, তথাপি ইহা বঙ্গদেশের নদীসমূহের ন্যায় পূর্ণতোয়া হয় নাই। মসলিপত্তন নামক প্রসিদ্ধ বাণিজ্যপ্রধান নগর এই নদীর নিকটে অবস্থিত।

পুরাণ-প্রসিদ্ধ কাবেরী নদী মহীশূররাজ্য ভেদ করিয়া এবং ইতিহাসবিখ্যাত শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গমূল ধৌত করিয়া সাগরাভিমুখে ধাবমানা। বোধ হয় সৌন্দর্য্যে ভারতের কোন নদী কাবেরীর সমকক্ষ নয়। মহীশূরের রাজধানী বাঙ্গালোরের নিকটে কাবেরীর যে জলপ্রপাত আছে, তাহা ভারতের একটী দর্শনীয় বস্তু।

উত্তর ভারতের ন্যায় দক্ষিণাপথে উর্ব্বরা ভূমির প্রাচুর্য্য না

থাকিলেও কুমারিকা অন্তরীপ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী ভূভাগ পূর্ব্বপ্রান্ত দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার উর্ব্বরতাশক্তি নিতান্ত অল্প নহে। এই ভূখণ্ডে ইক্ষু, ধান্য, তামাক ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মান্দ্রাজ, আরকট, পণ্ডিচেরী, ত্রিচিনাপলি প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী নগর এই অংশেই অবস্থিত। ভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিমঘাট শৈলশ্রেণীর পদতল স্পর্শ করিয়া যে উর্ব্বর ভূখণ্ড উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহাই মালবদেশ। এই ভূভাগে যথেষ্ট ধান্য উৎপন্ন হয় এবং নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য অরণ্যে প্রচুর সেগুন ও চন্দন কাষ্ঠ জন্মে।

দক্ষিণাপথের নীলগিরি আর একটী উল্লেখযোগ্য মনোরম স্থান। যে ত্রিভুজাকার উচ্চ পার্ব্বত্যভূমি লইয়া দক্ষিণ ভূ গঠিত, তাহারই দক্ষিণ প্রান্তে এই গিরিশ্রেণী অবস্থিত। হিমালয় বা আল্‌প্‌স্‌ প্রভৃতি পর্ব্বতের ন্যায় ইহা উচ্চ না হইলেও, যে নিবিড় অরণ্য ও লতাপুষ্পফলে এই ক্ষুদ্র পর্ব্বত সমগ্র বৎসর আবৃত থাকে ; তাহাই ইহাকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। উতকামন্দ-নামক প্রসিদ্ধ শৈলনিবাস এই পর্ব্বতের উপরেই অবস্থিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য হিমালয়ের অঙ্কস্থিত কাশ্মীর ও নেপাল প্রভৃতির প্রসিদ্ধি থাকিলেও, ঐ স্থানগুলি দুর্গম বলিয়া তাহাদের সৌন্দর্য্য সাধারণের উপভোগ্য হয় না ; এই কারণে উতকামন্দ বা তাহার সন্নিহিত দ্রষ্টব্য স্থানসমূহ জনসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছে।

গোদাবরী।

উত্তর ভারতের বহু ক্ষুদ্র-বৃহৎ নদনদীর মধ্যে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গাই শ্রেষ্ঠ। হিমালয়ের উত্তরে কৈলাস পর্ব্বতের পাদমূলে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের উপর দিয়া আসামে প্রবেশ করিয়াছে। তিব্বতে ইহা সান্-পো নামে খ্যাত। আসামে সদিয়ার নিকট হইতে কিয়দ্দূরপর্য্যন্ত ইহা ডিহাঙ্গ নামে পরিচিত। পরে ডিহাঙ্গ ও লোহিত নদীদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া তিব্বতের সেই ক্ষীণকায় সান্‌পো নদ আসামে আসিয়া ব্রহ্মপুত্র নামে খ্যাত হইয়াছে। এই বহুরূপী নদের যে অংশকে আমরা ব্রহ্মপুত্র বলি, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় সার্দ্ধ চারি শত মাইল। শত বাধা অতিক্রম করিয়া এবং উচ্চ ভূমি ধৌত করিয়া ইহা যে ভূভাগের কত বৈচিত্র্যবিধান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তাই হয় না। ইহার উভয়কূলের দৃশ্যও পরম মনোরম। আসাম ত্যাগ করিবার কালে ব্রহ্মপুত্র গারো পর্ব্বতকে বেষ্টন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। পরে ইহা দেড় শত মাইল পর্য্যন্ত যমুনা-নামে খ্যাত। ইহার পর বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্ত্তী স্থানে উৎপন্ন মেঘনা-নামক নদীর সহিত মিলিত হইয়া উহা এত প্রবল হইয়া পড়িয়াছে যে, এই সঙ্গম-স্থলে ব্রহ্মপুত্রের লীলা দেখিয়া তাহাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ নদ বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের যে সকল শুষ্ক স্থান দিয়া গঙ্গা ও সিন্ধুর ক্ষীণধারা প্রবাহিত, খাল খনন করিয়া নদীর জল চারিদিকে লইয়া না গেলে তথায় কৃষিকার্য্য চলে না। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের

জলরাশিকে সে প্রকারে কৃষিকার্য্যে প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হয় না। হিমালয় ও আসামের উচ্চ স্থান হইতে ইহার প্রবাহের সহিত যে মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া আইসে, তাহা দুই কূলের বিস্তীর্ণ ভূমির উপরে সঞ্চিত হইয়া প্রতিবৎসরেই ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে থাকে।

সমুদ্রতীর হইতে ডিব্রুগড় পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় চারি শত ক্রোশ। এই দীর্ঘ জলপথে বাষ্পীয় পোত ও নৌকা বৎসরের সকল সময়েই গমনাগমন করিতে পারে। ব্যবসায়িগণ আসাম হইতে চা, কাষ্ঠ, তুলা এবং পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাট, তামাক ও ধান্যাদি শস্য এই সুযোগে নানা দেশে প্রেরণ করিয়া এবং বিদেশ হইতে নানা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী স্বদেশে আনয়ন করিয়া দেশের যথেষ্ট ধনবৃদ্ধি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধান করিতেছেন।

প্রার্থনা।

তোমারি রাগিণী জীবনকুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমারি আসন হৃদয়পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো।
তব নন্দনগন্ধমোদিত
ফিরি সুন্দর ভুবনে;
তব পদ-রেণু মাখি লয়ে তনু
সাজে যেন সদা সাজে গো।

সব বিদ্বেষ দূরে যায় যেন
তব মঙ্গলমন্ত্রে,
বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে
তব সঙ্গীত-ছন্দে;
তব নির্ম্মল নীরব হাস্য
হেরি অম্বর ব্যাপিয়া—
তব গৌরবে সকল গর্ব্ব
লাজে যেন সদা লাজে গো।

সম্পূর্ণ।